শ্রেষ্ঠ কবিতা

গোলাম মোস্তফা

আলোকিত মানুষ চাই

শ্রেষ্ঠ কবিতা

গোলাম মোস্তফা

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৯৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪০৮ জানুয়ারি ২০০২

দ্বিতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৮ নভেম্বর ২০১১

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0192-2

ভূমিকা

১

কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) : তাঁর মৃত্যুর চার দশক পরেও আজো সুপরিচিত। 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি/ বিচার দিনের স্বামী।/ যত গুণগান, হে চির-মহান,/ তোমারি অন্তর্যামী!'; 'তুমি যে নূরের রবি/ নিখিলের ধ্যানের ছবি/ তুমি না এলে দুনিয়ায়/ আঁধারে ডুবিত সবি।'; 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে' :—গোলাম মোস্তফার কবিতা-গানের এসব পঙ্‌ক্তি অমর হয়ে আছে। রবীন্দ্র-প্রভাবিত রবীন্দ্র-ভক্ত কবিদের একজন গোলাম মোস্তফার কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের পরম্পরাও আছে ; কিন্তু এসবের মধ্যেও তাঁকে তাঁর আত্মস্বভাবে চেনা যায়।

জন্ম ১৮৯৭ সালে, যশোরের মনোহরপুর গ্রামে। 'শেষের কবিতা' নামে একটি ছোট কবিতায় কবি লিখেছেন : 'এখানেই ফিরে আসিলাম/ মায়ের বুকেই শেষ শয্যা রচিলাম।/ মুক্ত চারিধার/ এই মাটি এই তৃণ কোথা পাব আর?' এই সরল-সচ্ছল-অনাবিল প্রকাশ তাঁর আবহমান কবিতায় দেখা গেছে। কবির পিতামহ নীলকরদের বিরুদ্ধে কয়েকটি উদ্দীপক কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কবি বি. এ. এবং বি. টি. পাস করেছিলেন—এবং নামের শেষে ব্যবহারও করতেন। পেশায় ছিলেন সরকারি স্কুলের শিক্ষক—হেডমাস্টার হিশেবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। মূলত ছিলেন কবি ; গায়ক ও সংগীতকার হিশেবেও সমকালে যশ পেয়েছিলেন; গদ্যও লিখেছেন। দেশবিভাগের আগে 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র দ্বিতীয় মুখপত্র 'সাহিত্যিক' (১৯২৭) মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) এবং তিনি যুগ্মভাবে সম্পাদনা করতেন। দেশবিভাগের পরে 'নওবাহার' (১৯৪৯) নামে একটি পত্রিকা নেপথ্যভাবে তিনি সম্পাদনা করতেন। 'লেখক সংঘ পত্রিকা'ও সম্পাদনা করেছেন কিছুকাল। তাঁর কবিতাগ্রন্থ এই ক'টি : *রক্তরাগ* (১৯২৪), *হাস্নাহেনা* (১৯২৭), *খোশরোজ* (১৯২৯), *কাব্য-কাহিনী* (১৯৩২), *সাহারা* (১৯৩৬), *মুসাদ্দাস-ই-হালী* (১৯৪১), *তারানা-ই-পাকিস্তান* (১৯৪৮), *কালাম-ই-ইকবাল* (১৯৫৭), *বনি-আদম* (১৯৫৮), *শিকোয়া ও জবাব-ই-শিকোয়া* (১৯৬০)। এছাড়া আছে নির্বাচিত কবিতাগ্রন্থ : *বুলবুলিস্তান* (১৯৪৯)। গদ্যগ্রন্থও আছে কয়েকটি, তার মধ্যে খ্যাততম *বিশ্বনবী* (১৯৪২)। এই বইটি বাংলা ভাষায় রচিত হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর একটি শ্রেষ্ঠ জীবনী। মধ্যযুগ থেকে বাংলা সাহিত্যে কবিতায় ও গদ্যে অগণন রসূল-চরিত রচিত হয়েছে—এই সমস্তের মধ্যেই *বিশ্বনবী*

অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিশেবে পরিগণিত। ১৯৬৪ সালে কবি গোলাম মোস্তফার ইন্তেকালের পরে অনুজ কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬) বলেছিলেন : গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ কীর্তি *বিশ্বনবী*। ইসলাম সম্পর্কে গোলাম মোস্তফা সবসময় সশ্রদ্ধ, মুসলমানের জাগরণ তাঁর সব সময় কাম্য, তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়ই ইসলাম ও মুসলমান, কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর যে-বীতরাগ তা ব্যক্তিগত নয়—ঐ ইসলামি দৃক্‌ভঙ্গির কারণেই সঞ্জাত। কবিতার তথা শিল্পসাহিত্যের যে এক স্বতন্ত্র প্রমুক্তি আছে, তা তিনি ঠিক বুঝতে চাইতেন না।

তাঁর কবিতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যেও কোনো অস্বচ্ছতা ছিল না, কপটতা ছিল না। গোলাম মোস্তফা ইসলাম-ভক্ত ছিলেন, আবার রবীন্দ্র-ভক্তও ছিলেন। 'বঙ্গীয়-মুসলমান- সাহিত্য-পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৩২৯ সংখ্যায় তিনি 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন : ' কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকবিতায় যে ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইসলামের চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহার ভাব ও ধারণাকে যে-কোনো মুসলমান অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। বাংলা ভাষায় আর কোনো কবি অমন করিয়া মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই।' 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র পরবর্তী সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র মুদ্রিত হয় : 'আপনাদের পত্রিকায় 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক লেখাটি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। মুসলমানের প্রতি আমার মনে বিন্দুমাত্র বিরাগ বা অশ্রদ্ধা নাই বলিয়া আমার লেখায় কোথাও তাহা প্রকাশ পায় নাই।—৯ মাঘ ১৩২৯।' 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত (ফাল্গুন ১৩২৯) গোলাম মোস্তফার 'রবীন্দ্রনাথ' সনেটটি অনবদ্য (বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)। প্রসঙ্গত স্মরণীয় : রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত *বাংলা কাব্য-পরিচয়* (১৯৩৮) সংকলনে গোলাম মোস্তফার দুটি কবিতা গৃহীত হয়েছিল—'পল্লী-মা' এবং 'কিশোর'।

রবীন্দ্রানুসারী কবিদের যদি একটি দীর্ঘ তালিকা করা যায়, তার মধ্যে নাম আসবে কবি গোলাম মোস্তফার। আবার প্রথম মুসলমান আধুনিক বাঙালি কবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)-এর অভ্যুদয়ের পরে যে-দুজন কবি প্রথম প্রকৃত লিরিক কবিতার সাধনা করেন, গোলাম মোস্তফা তাঁদের একজন। ওয়াকিফহাল 'সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪) যথার্থই লিখেছেন, 'কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সওগাতে' যোগদান করার সময় থেকে আমাদের সমাজে নূতন নূতন কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। এর পূর্বে শাহাদাৎ হোসেন ও গোলাম মোস্তফার কবিতাই 'সওগাতে' এবং আমাদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেশির ভাগ ছাপা হত।' (*বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ১৯৮৫) শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) এবং গোলাম মোস্তফাই বাঙালি-মুসলমান সমাজে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত লিরিক কবিতার উদ্বোধন ঘটান। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *আধুনিক কাব্য-সংগ্রহ* (১৩৭০) সংকলনে গোলাম মোস্তফার ধারাক্রমিক অবস্থানটি লক্ষ করা যাক : খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১), মোহাম্মদ দাদ আলী (১৮৫৬-১৯২৯), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর, ১৮৬০-১৯৩৩), আবু

মালেক মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৪-?), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮৫-১৯৫৬), শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৭), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), শেখ হবিবর রহমান (১৮৯১-১৯৬২), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের আগে শাহাদাৎ হোসেন ও গোলাম মোস্তফাই লিরিক কবিতার সাধক। আত্যন্তিক বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও গোলাম মোস্তফা নজরুল-সাহিত্য আস্বাদন করতেন, নজরুল-সংগীত গাইতেন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির একটি অধিবেশনে সংগীত-জলসার অধিনায়কত্ব করতে গিয়ে তিনি স্বীকার করেছিলেন, 'সুরের দুলাল' নজরুল যা পেরেছেন তিনি বা তাঁরা তা পারেননি। ব্যক্তিমানুষটি সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, 'কবি গোলাম মোস্তফা অতিথিবৎসল ছিলেন। তাঁর পরিচিত সকলেই তাঁর গৃহে কোনো-না-কোনো সময়ে আপ্যায়িত হয়েছেন। আমি লক্ষ্য করেছি যে, এ আপ্যায়নের মধ্যেও কোনোপ্রকার অহমিকা ছিল না, স্বার্থবুদ্ধি ছিল না, ছিল একটি সহজ আনন্দ এবং অমায়িকতার প্রকাশ। যাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা হয়েছে এবং অনেক কটু কথায় যাদেরকে তিনি লাঞ্ছিত করেছেন এমন লোককেও তিনি তাঁর গৃহে অকৃত্রিম সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।' (*কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা*, ১৩৭৫) এই সরল সচ্ছল সাবলীল অমায়িকতা ও সহৃদয়তা তাঁর কবিতারও কেন্দ্রীয় স্বভাব।

২

১৯১৬ সালের দিকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন গোলাম মোস্তফা, কবিতায়, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)-সম্পাদিত 'আল-এসলাম' পত্রিকায়। বাংলা কবিতায় তখন রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথের পূর্ণ প্রতাপ চলছে—গোলাম মোস্তফা তার দ্বারাই অভিভূত-পরিপ্লুত হন, উত্তরকালে নজরুলের ছায়া ও আতপ পড়েছে তাঁর কবিতায়। শেষ-পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গেই বোধহয় তাঁর সাযুজ্য বেশি : তাঁর কাল্পনিকতায় নয়—তাৎক্ষণিকতায়। তাঁর ঐ প্রথম পর্যায়ে, 'আল-এসলামে' প্রকাশিত কবিতাগুলো হচ্ছে : 'মিছে চাওয়া', 'এসলাম', 'আজান', 'বর্ষবিদায়', 'অপ্রকাশ', 'পল্লী-বালিকার কলিকাতা-বিরাগ', 'বঙ্গনারী', 'বর্ষশেষে', 'অভাগী', 'দয়াময়', 'বাল্য-স্মৃতি' প্রভৃতি। নাম থেকেই স্বতঃপ্রকাশ : গোলাম মোস্তফা বিষয়বস্তু-প্রধান কবি। ঐ অল্পবয়সে স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)-র মতো লেখকের কাছ থেকে : 'বাঙ্গালার কায়কোবাদ, সিরাজী, মোস্তফা, মোজাম্মেল কোনো বিষয়ে হীন নহেন।' ('আত্মসম্মান ও নির্ভরতা', 'আল-এসলাম', মাঘ ১৩২৬) লক্ষণীয় : বিষয়বস্তুর দিক থেকে তখনি তিনি সরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ থেকে—ইসলাম, আজান, ফারসি কবি জামী-র কবিতা থেকে অনুবাদ তখনি দেখা দিয়েছে। 'আল-এসলাম' পত্রিকার অন্তঃশীল ধারাবাহিকতা গোলাম মোস্তফার জীবনব্যাপী অনুসৃত। ১৯২৪ সালে তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ *রক্তরাগ* যখন প্রকাশিত হল, তার প্রথম কবিতা

'পরিচয়'-এ এভাবে নিজেকে কবি পরিচিত করছেন :

যে জাতি একদা ঊষর-ধূসর ভীষণ আরব দেশে
বিরাজ করিত অতীব তুচ্ছ, অতীব ঘৃণ্য বেশে,
জীবন-মন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র ভুলিয়া যাহারা হায়
মরার অধিক পড়িয়া রহিল সুনিবিড় তমসায়!
সহসা আবার নবীন মন্ত্রে লভিল যাহারা প্রাণ,
তারাই আজি সে বিশ্ব-ব্যাপ্ত—আমরা মুসলমান।

১৯২২ সালে নজরুল ইসলামের *অগ্নি-বীণা* প্রকাশিত হয়েছিল। বিশের দশক ছিল বাঙালি-মুসলমানের জাগরণের উজ্জ্বলতম দশক। কবি গোলাম মোস্তফা, নজরুল এবং আরো অনেকের সঙ্গে এই জাগরণের দীপ্ত অংশীদার। *রক্ত-রাগ* কবিতাগ্রন্থের 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা থাকলেও *অগ্নি-বীণা* বা নজরুলের অন্যান্য কবিতা-গানের মতো গোলাম মোস্তফার কেন্দ্র-কথা ছিল না; হিন্দু-মুসলমানের পুরাণ-ইতিহাসকেও নবীভূত করেননি গোলাম মোস্তফা নজরুলের মতো; ওজস্‌ও ছিল না ওরকম। তিনি বরং ইসলামের নতুন ও পুরনো ইতিহাসকে একটি ছন্দোময় বস্তুভিত্তিতে উপস্থাপিত করেছিলেন। *রক্ত-রাগ* কাব্যগ্রন্থেই নজরুলের *অগ্নি-বীণা*-র অন্তর্ভূত 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রত্যুত্তরে রচিত 'নিয়ন্ত্রিত' স্থান পেয়েছিল। এক-হিশেবে 'নিয়ন্ত্রিত' কবিতার মধ্যেই কবি গোলাম মোস্তফার সারসত্তা নিহিত। শুধু নজরুলের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য নয়— তাঁর চারিত্রগত সংযতি-সংহতিতে জীবনকে তিনি দেখেছেন, একটি অদ্রোহী শান্ত সামঞ্জস্যে, মাধুর্যে, আনন্দময়তায়। আর এখানেই তাঁকে মনে হয় রবীন্দ্র-পথিক।

এই সুন্দর-চির-উজ্জ্বল-চারু-চিত্র বহুল বিশ্ব,
এই শ্যাম শোভাময়ী নিতি নব নব দৃশ্য,
এ নহে শুধুই 'শোক-তাপ-হানা খেয়ালি বিধির' সৃষ্টি
পিছনে তাঁহার জেগে আছে তাঁর দিব্য আঁখির দৃষ্টি।

দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে গোলাম মোস্তফার ভূমিকা এক দর্শকের—আনন্দময় রবিকরোজ্জ্বল দর্শকের। সেজন্যেই অদ্রোহিতা সংযতি সংহতি তাঁর কাঙ্ক্ষণীয় এবং বরণীয়। তাই 'পরপারের কামনা' কবিতার এরকম উপসংহার :

নিখিলের এই শোভা, এই হাসি, এই রূপরাশি,
মরিয়াও আমি যেন প্রাণ দিয়ে সবে ভালোবাসি।

তাই বলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চিত্রলতায় তিনি মগ্ন-মত্ত হয়ে যান না। নারীস্তোত্র তিনি রচনা করেছেন, প্রেমের জয়ের ঘোষণা করেছেন। 'নারী' কবিতার সূচনারম্ভে তিনি কুরআন শরিফের সূরা বাকারা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'এবং তথায় (স্বর্গোদ্যানে) তাহারা (পুণ্যবান পুরুষেরা) পবিত্রা সঙ্গিনী পাইবে এবং অনন্তকাল তথায় বাস

করিবে।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নারীর ভিতর দিয়ে নারীর অধিক চৈতন্যের উদ্বোধন ও অধিষ্ঠান তিনি করেন না। 'পল্লী-মা' কবিতায় রবীন্দ্রানুসারী যতীন্দ্রমোহন বাগচী-কালিদাস রায়-কুমুদরঞ্জন মল্লিকদের জগৎ পুনর্বিম্বিত।

সাহারা এবং *হাস্নাহেনা* কাব্যগ্রন্থদ্বয় প্রেমের কবিতাগ্রন্থ। প্রিয়তমার সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনাই গোলাম মোস্তফার প্রেমের কবিতার মূল উৎস। 'পাষাণী' কবির দীর্ঘতম প্রেমের কবিতা। নজরুলের 'পূজারিণী'র স্মারক । *কাব্যকাহিনী* রবীন্দ্রনাথের *কথা ও কাহিনী*-কে মনে পড়িয়ে দ্যায়; কালিদাস রায় (১৮৮২-১৯৭৫) এ-ধরনের কাহিনীকাব্য লিখেছেন বেশ-কিছু; বস্তুত এই ধরনের কাহিনীধর্মী কবিতার চল্ ছিল একসময়। এই ধরনের আখ্যায়িকা-কবিতায় গোলাম মোস্তফার বিশিষ্টতা এখানে যে, তিনি ইসলামের ইতিহাস থেকে তাঁর কাহিনী প্রধানত নির্বাচন করেছেন। *বনি-আদম* মহাকাব্য-আকাঙ্ক্ষী কাব্যগ্রন্থ : আদম ও হাওয়ার ইতিবৃত্ত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)-এর পরম্পরা যে একশো বছর বাহিত হয়েছে, তার সাক্ষ্য দ্যায় এই কাব্যগ্রন্থ। ১৪-মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কবিতা-প্রবেশক ব্যতিরেকে ১২টি সর্গে (সর্গগুলির নাম দিয়েছেন কবি 'মন্‌জিল') গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়েছে। বলা বাহুল্য, গোলাম মোস্তফা মূলত গীতিকবি।

গায়ক ও সুরকার ছিলেন বলেই গোলাম মোস্তফার উল্লেখযোগ্য সাফল্য সংগীতে। প্রেম ও দেশপ্রেমের গান তিনি লিখেছেন; কিন্তু ইসলামি গানেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য বেশি। 'সংগীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা'-র মতো পত্রিকায় গোলাম মোস্তফার গান স্বরলিপি সমেত সেকালে প্রকাশিত হয়েছে। 'সওগাত' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৩ সংখ্যায় কবির 'জাগরণী' শীর্ষক গান প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে লেখা ছিল : কথা, সুর ও স্বরলিপি—গোলাম মোস্তফা বি.এ.বি.টি.। গানটির প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি এরকম : 'রুদ্ধ দ্বার আজ মুক্ত কর্ তোরা, ওঠ্ জেগে ভাই মুসলেমীন!/ গাফ্‌লাতির এই ঘুমঘোরে বল্ আর কতকাল রইবি লীন?' সম্পাদকীয় নোট্‌টি উল্লেখযোগ্য : 'এই ধরনের গান জাতীয় সভা-সমিতি ও উৎসবাদিতে গীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার স্বরলিপি অন্যত্র দেওয়া হইল।'

১৯৩৮ সালে কবি-সমালোচক আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪) গোলাম মোস্তফার কবিতাকে 'বস্তুতান্ত্রিক কবিতা' হিশেবে নির্দিষ্ট করেছিলেন, 'বুলবুল' পত্রিকায়। এটা ঠিকই, গোলাম মোস্তফা কল্পনাপ্রভব কবি ছিলেন না, বরং ছিলেন অনেকখানি বহির্মুখিন। অকুটিল অজটিল সরল সবল সচ্ছল তাঁর কবিতা। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকালমৃত্যুর পরে-পরেই 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় (শ্রাবণ ১৩২৯) 'সত্যেন্দ্র-স্মৃতি' নামের এলেজি-কবিতায় নিজের পরিচায়নে তিনি লিখেছিলেন 'অজ্ঞাত এই সাগরেদ'। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতোই অন্তর্মুখিনতা ছিল না তাঁর : ইসলাম ও মুসলমান তাঁর প্রধান বিষয় ছিল, তার মরমী ভাবাবহকে তিনি ততখানি গ্রহণ করেননি, যতটা করেছিলেন তার বহিরাচারকে। তাঁর প্রেম, দেশপ্রেম, সমাজ-ও-রাজনীতিচেতনার মধ্যেও ঐ বাস্তবতার ব্যবহারই ছিল মুখ্য।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই 'সাগরেদে'র মধ্যে তাঁর একটি প্রবহণ ছিল। তা আর কিছু নয়—'ছন্দের জাদুকরে'র ছন্দচেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল গোলাম মোস্তফার ভিতরে।

ছন্দচেতনা নয়, উপমাচেতনা নয়, সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রলতাও নয়—গোলাম মোস্তফার কবিতায় দেখা যাবে বিচিত্র-বিবিধ ছন্দের উৎসাহ। গোলাম মোস্তফার *কাব্যগ্রন্থাবলী*-র ভূমিকায় আবদুল কাদির বলেছেন : '...মাত্রাবৃত্তের কবিতাতেই তাঁর শক্তির স্ফূর্তি হয়েছে সমধিক ও সচ্ছন্দ।' আমরা লক্ষ করব, গোলাম মোস্তফা প্রধান সবরকম ছন্দে লিখেছেন, এমনকি অমিত্রাক্ষর ছন্দেও। 'কিশোর'-এর মতো তাঁর বিখ্যাত কবিতা স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছন্দবৈচিত্র্য ও ছন্দস্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কবিস্বভাবেরই পরিচায়ক।

শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা ও কাজী নজরুল ইসলাম—বাঙালি-মুসলমান সমাজের এই তিনজন কবি মোটামুটি একই সময়কালে কাজ করে গেছেন। তারই মধ্যে তিনজনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাঁদের আপনাপন কবিতায় স্বাক্ষরিত : শাহাদাৎ হোসেন গম্ভীর ও ধ্রুপদস্বভাবী, নজরুল ইসলাম তেজস্বী ও উত্তাল, আর গোলাম মোস্তফা সরল ও স্বভাবসম্মত।

৩

গোলাম মোস্তফার *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বই-এর কবিতাগুচ্ছ নির্বাচন ও চয়ন করা হয়েছে আহমদ পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত গোলাম মোস্তফার *কাব্যগ্রন্থাবলী* (প্রথম খণ্ড, ১৯৭১) থেকে। এই সংগ্রহে কবির প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ (*বুলবুলিস্তান* কবির স্বনির্বাচিত কবিতাসংগ্রহ বলে বাদ গেছে ঐ গ্রন্থাবলিতে) থেকে। তবে গোলাম মোস্তফার কবিতার একটি অখণ্ড চারিত্র নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য ছিল বলে কবিতার বিন্যাসে রচনা বা প্রকাশের কোনোরকম ধারাক্রম রক্ষা করা হয়নি। গোলাম মোস্তফা কবি ইকবাল ও হালী-র কবিতার ব্যাপক তর্জমা করেছেন। অনুবাদের নিদর্শন হিশেবে কয়েকটি কবিতা এই গ্রন্থের শেষাংশে বিন্যস্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের মতো সংগীতেও পারঙ্গমতা ছিল কবির; গান গাইতেন, গান লিখতেন, সুর দিতে সক্ষম ছিলেন, স্বরলিপি করতে পারতেন। বাংলা গজল-গানের রেওয়াজ নজরুলের আগেও ক্ষীণভাবে ছিল; মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (১৮৬১-১৯০৭) প্রমুখ কেউ কেউ গজল-গান লিখতেন; গোলাম মোস্তফাও নজরুলের আগেই, এবং তাঁর সমকালে, গজল-গান লিখেছেন, এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন। মিলাদ-মহফিলে গোলাম মোস্তফার গান ('তুমি যে নূরের রবি/নিখিলের ধ্যানের ছবি...') তাঁর ইসলামি গজল-গানের তুঙ্গতম স্বীকৃতি; প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ-র (১৮৯৪-১৯৭৮) আলোচনায় আছে তাঁর সেকালের গানের স্বীকৃতির সাক্ষ্য : '...দূর পল্লীর রাখাল বালকের কণ্ঠে কণ্ঠে কাজী-মোস্তফার গান ঝংকৃত হয়ে মুক্ত প্রান্তর মুখর করে তুলছে...' ('মুসলমানের সাহিত্য-সেবা', 'বুলবুল', কার্তিক ১৩৪৩)। কবির বিখ্যাত কয়েকটি গান গ্রন্থভূর্ত হল।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় গোলাম মোস্তফার কবিতা-গানের একটি মূল্য আছে। তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে তারই মূল্যাঙ্কন। নতুন পাঠক-সমাজ এ বিষয়ে যত অবহিত হবেন, ততই আমাদের অগ্রবর্তিতার পথ খুলে যাবে ॥

আশ্বিন ১৪০৮ **আবদুল মান্নান সৈয়দ**

সূচি

কুড়ানো মানিক ১৩
১৪ পল্লী-মা
১৬ শ্যালিকা
১৭ কিশোর
১৮ রবীন্দ্রনাথ
১৮ সত্যেন্দ্র-স্মৃতি
২০ নিয়ন্ত্রিত
২৪ বউ কথা কও
২৭ অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
২৭ কবির প্রেম
৩১ কবির আঁখি
৩২ সন্ধ্যারানী
৩৩ রক্ত-রাগ
৩৩ হাস্নাহেনা
ফাতেহা-ই-দোআজ-দহম (আবির্ভাবে) ৩৪
ঈদ-উৎসব ৩৬
হে খুদা দয়াময় ৩৭
নিখিলের চির-সুন্দর সৃষ্টি ৩৭
তুমি যে নূরের রবি ৩৮
মানুষ ৩৯
প্রতীক্ষায় ৪২
রাখাল-খলিফা ৪৪
জীবন-বিনিময় ৪৭
রাখী ভাই ৪৯
মুসাদ্দাস-ই-হালী ৫১
উট-চালকের গান ৫৩
মুনাজাত ৫৪

কুড়ানো মানিক

আনমনে একা একা পথ চলিতে
দেখিলাম ছোট মেয়ে ছোট গলিতে,
হাসি-মাখা মুখখানি চির-আদুরী,
ঝরে-পড়া স্বরগের রূপ-মাধুরী!

ফণিনীর মতো পিঠে বেণী ঝুলিছে,
চঞ্চল সমীরণে দুল দুলিছে,
মঞ্জীরধ্বনি বাজে চল-চরণে
মিহি নীল ফুরফুরে শাড়ি পরনে।

বস্ত্রের আবরণ-কারা টুটিয়া
অঙ্গের হেম-আভা পড়ে লুটিয়া!
মিষ্টি মধুর আঁখি, দৃষ্টি চপল,
বঙ্কিম ক্ষীণাধর, রক্ত-কপোল।

চলে গেল পাশ দিয়ে ক্ষিপ্র পদে—
বিজুলির ছোট রেখা নীল-নীরদে!
ছুঁয়ে দিনু কেশ-পাশ ভালোবাসিয়া
নেচে নেচে গেল সে যে মৃদু হাসিয়া!

শিহরিয়া উঠিলাম ঘন-পুলকে
হারাইয়া গেনু কোথা কোন্ দ্যুলোকে!
ভরে গেল সারা প্রাণ একী হরষে!
এতখানি সম্পদ মৃদু-পরশে!

পথ মাঝে কুড়াইয়া পেনু যে মণি
সে যে মোর হৃদিমাঝে হরষ-খনি।

পল্লী-মা

পল্লী-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে প্রবাস-পথে
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকিয়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায়বেলার বিয়োগব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

চির-চেনার গণ্ডি কেটে বাইরে এসে আজকে প্রাতে
নূতন করে দেখা হল অনাদৃতা মায়ের সাথে
ভক্তি-পূজা দিইনি যারে ভুলেও যাহার বক্ষে থেকে
নম্র শিরে প্রণাম করি দূর হতে তার মূর্তি দেখে।

স্নেহময়ী রূপ ধরে মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক হতে ওই দিগন্তরে :
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙ্গিনাতে,
দেখছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে।

ওই-যে মাঠে গরু চরে লেজ দুলিয়ে মনের সুখে,
ও যে পাখির গানের সুখে কাঁপন জাগে বনের বুকে,
'মাথাল্' মাথায় কাস্তে হাতে ওই-যে চলে কালো চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে—ওরাই মায়ের ভালোবাসা।

ওরা কভু ভোগ করে না অন্নজলের বিষম জ্বালা
মায়ের বুকের পীযূষ-ধারা ওদের তরে নিত্য-ঢালা :
মাঠ-ভরা ধান, গাছ-ভরা ফল, যার খুশি সে যাচ্ছে খেয়ে
মুক্ত মায়ের অন্নশালা, হয় না নিতে কিছুই চেয়ে!

ওরা সবাই সহজ ভাবে ঠাঁই পেয়েছে মায়ের কোলে,
শান্তি-সুখে বাস করে সব, কাটায় না দিন গণ্ডগোলে,
গরু-মহিষ যে ঠাঁই চরে, শালিক তাহার পাশেই চরে
কখনোবা পৃষ্ঠে চড়ে কখনোবা নৃত্য করে!

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু বাজায় বেণু অশথ-মূলে
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠল দুলে;
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাঁধন টুটে
মায়ের মুখের হাসির মতো কমল-কলি উঠল ফুটে!

দুপুরবেলায় ক্লান্ত হয়ে রৌদ্র-তাপে কৃষক ভায়া
বসল এসে গাছের ছায়ায় ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধ-ছায়া,
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি কচি ওই-যে পাতা,
ও যেন মার আপন-হাতে-তৈরি-করা মাঠের ছাতা!

ঘাম-ভেজা তার ক্লান্ত দেহে শীতল সমীর যেমনি চাওয়া,
পাঠিয়ে দিল অমনি মা তার স্নিগ্ধ-শীতল আঁচল-হাওয়া,
কালো দিঘির কাজল জলে মিটাল তার তৃষ্ণা-জ্বালা,
কোন্ সে আদি কাল হতে মা রেখেছে এই জলের জালা!

সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখলে চেয়ে,
রঙিন আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে :
ওদেরি ও ঘরের জিনিস, আমরা যেন পরের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে!

ওই-যে লাউ-এর জাংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে
কৃষক-বালা আসছে ফিরে নদীর পথে কল্‌সি পুরে,
ওই কুঁড়ে ঘর—উহার মাঝেই যে-চিরসুখ বিরাজ করে,
নাইরে সে সুখ অট্টালিকায়, নাইরে সে সুখ রাজার ঘরে!

কত গভীর তৃপ্তি আছে লুকিয়ে যে ওই পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ নাইবা জানুক—সে কথা মোর মনই জানে!
মায়ের গোপন বিত্ত যা তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু
মোদের মতো তাই ওরা আর ছোটে নাকো মোহের পিছু।

আজকে আমার মন ভুলেছে মাটির মায়ের এই যে রূপে,
আপন মনে আফসোসেতে কাঁদছি যে তাই চুপে চুপে।
বাষ্প-শকট—সে যেন কোন্ অসৎ ছেলের মূর্তি ধরে
ফুস্‌লে আমায় যাচ্ছে নিয়ে শিস্ দিয়ে আর ফূর্তি করে!

তাই যেন মা দেখ্‌ছে মোরে গভীর ব্যথায় নয়ন মেলে—
যেমন করে দেখে মা তার ধ্বংস-পথের পথিক ছেলে!
প্রণাম করি তোমায় মা গো, ভক্তি ভরে—নম্রশিরে,
ক্ষমা করো : আবার আমি তোমার বুকে আসব ফিরে।

শ্যালিকা

বুঝে পড়ে দেখিলাম করি তালিকা—
সবচেয়ে সুমধুর ছোট শ্যালিকা!
নাই তার তুল
মন মশগুল্!
প্রাণ-পাওয়া বাসরের ফুল-মালিকা।

প্রেয়সীর আদরের ছোট ভগিনী
সুখে দুখে চিরদিন সহযোগিনী।
রাঙা টুক্‌টুক্
হাসি মাখা মুখ
ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ উপভোগিনী।

আধখানি সহোদরা আধখানি নয়—
আধখানি যেন তার সখী মনে হয়!
সখী আর বোন
সংমিশ্রণ!
অম্লের মাঝে মধু যেন মধুময়!

সে যেন গো বিবাহের তাজা যৌতুক,
প্রণয়ের পাশে চির প্রেম-কৌতুক!
ফাগুনের বন—
মৃদু সমীরণ!
বিয়ে-ফুল মধুকরা যেন মউটুক্।

এতদিন পরে আজি বুঝেছি মনে—
বধূ সে মধুর নয় শালী বিহনে!
শ্যালিকার দান
বড় এক স্থান
অধিকার করে আছে নর-জীবনে।

মোটা পণ-লালসায় মন ভোরো না,
শালী যেথা নেই সেথা বিয়ে কোরো না!

কিশোর

আমরা কিশোর, আমরা কচি, আমরা বনের বুল্‌বুলি,
সবুজ পাতায় শয্যা রচি, হাওয়ার দোলায় দুল্‌দুলি!
ঊষার আলোয় স্নান করি,
নিত্য নূতন তান ধরি,
সহজ তালে পাখনা মেলি উড়ে চলি চুল্‌বুলি!

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে।

সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটব মোরাও ফুটব গো,
অরুণ-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো!
নিত্য নবীন গৌরবে
ছড়িয়ে দিব সৌরভে
আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল বাঁধন টুট্‌ব গো!

কেউ বা যাব দেশ বিজয়ে, সাজব রাজা 'সিকন্দর'
সঙ্গে নিয়ে লক্ষ সেনা ছুটব গো দিগ্‌-দিগন্তর;
হাতি-ঘোড়ার চট্‌পটে
কামান-গোলার পট্‌পটে
দেশ-বিদেশের সকল রাজা কাঁপবে ভয়ে নিরন্তর।

সাগর-জলে পাল তুলে দে' কেউবা হব নিরুদ্দেশ,
কলম্বসের মতোই বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ!
জাগবে সাড়া বিশ্বময়—
এই বাঙালি নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।

কেউবা হব সেনা-নায়ক, গড়ব নূতন সৈন্যদল,
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র নেব, নাইবা থাকুক অন্য বল।
দেশমাতারে পূজব গো
ব্যথীর ব্যথা বুঝব গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি, ধন্য হবে অন্ন-জল।

জ্ঞান-গরিমা শিখব বলে কেউবা যাব জার্মানি
সবার আগেই চলব মোরা, আর কি কভু হার মানি?
শিল্পকলা শিখব কেউ,
গ্রন্থমালা লিখব কেউ,—
কেউবা হব ব্যবসাজীবী, কেউবা 'টাটা', 'কার্নানি'।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে!
আকাশ-আলোর আমরা সূত,
নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কী যে করব মোরা—নাইকো তাহার অন্ত রে!

রবীন্দ্রনাথ

আকাশে-ভুবনে বসেছে জাদুর মেলা,
নিতি নব নব খেলিতেছে জাদুকর—
রবি-শশী-তারা-ঝঞ্ঝা-অশনি-খেলা,
লুকোচুরি কত চলিছে নিরন্তর!

আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারাবেলা
কিছু বুঝি নাকো—বিস্মিত-অন্তর!
হাসা-কাঁদা আর ভাঙা-গড়া-হেলা-ফেলা
সকলেরি মাঝে ভরা জাদু-মন্তর!

কবি! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে,
পিতার ঘরের অনেক খবর জানো,
কেমন করিয়া কিসে কোন্ খেলা খেলে,
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আনো!

দর্শক মোরা, কিছু জানাশোনা নাই,
যাহা বলো, শুনি অবাক হইয়া তাই!

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

হায়! ছন্দের রাজ সত্যেন আজ নির্বাক নিশ্চল,
তার কণ্ঠের বীণ্ ঝঙ্কার-হীন, টঙ্কার নিষ্ফল!

আজ সংগীত-শেষ বাংলার দেশ, হর্ষের নাই লেশ,
নাই দীন-হীন মা'র কণ্ঠের হার—পাণ্ডুর তার বেশ।

আজ অম্বর-তল উচ্ছল-জল-ছলছল-চঞ্চল,
ঝরে ঝুরঝুর-ঝুর অশ্রুর সুর, ভরপুর অঞ্চল,
ঝরে বর্ষার বায় হায় হায় হায়, ধায় কোন্ বন্-বন্
এ কী উন্মাদ-রোল, হিন্দোল-দোল,—মৃত্যুর ক্রন্দন!

আজ কুঞ্জের গীত্ নিস্পন্দিত্, গম্ভীর বন্-পথ
নাই উৎসব-রব, নিঃশেষ সব সৌরভ-সরবৎ
আজ ফুলকুল হায় ঢুল্ঢুল্-কায়, বুল্বুল্-হীন বাগ,
তার বক্ষের পর জর্জর্ শর—নির্মম নীল দাগ!
আজ বিশ্বের বীণ গমগীন ক্ষীণ, ক্রন্দন ভরপুর
হায় স্থল-জল-নীল বন-মঞ্জিল সব ঠাঁই এক সুর!
ছিল সত্যের মাঝ কার কোন্ কাজ, কার কোন্ বন্ধন?
যার বিচ্ছেদ-দুখ্ কাত্রায় বুক উথ্লায় ক্রন্দন?

এ কী বিস্ময়! জয় 'সত্যের' জয় অব্যয় অক্ষয়!
পেনু মৃত্যুর মাঝ সন্ধান আজ 'সত্যের' সত্যয়,
সে যে বিশ্বের সূত নির্মল-পূত্ স্বর্গের সন্দেশ!
সে যে নন্দন-বন-ফুল-চন্দন, মর্তের বন্-দেশ!

সে যে রূপ-রস-রাগ সবজির দাগ, ফুলবন-নিশ্বাস,
সে যে সৃষ্টির সার, অন্তর তার সব্বার নির্যাস!
তাই উল্লাসহীন এই দুর্দিন বর্ষার সন্ধ্যায়
তার মৃত্যুর ভার অন্তর-তার সব্বার স্পন্দায়।

ওরে সত্যের প্রাণ সত্যের গান বিশ্বের সম্পদ,
এই বঙ্গের বাস নয় তার খাশ—নয় তার কম-পদ,
সারা বিশ্বের পর সব তার ঘর, কেউ নয় পর-পর
এই নির্ঝর-নীর, গঙ্গার তীর, পত্রের মর্মর।

ওরে সত্যের প্রাণ সত্যের গান মৃত্যুর নয় বশ,
কভু সত্যের ক্ষয় সম্ভব নয়—অব্যয় তার যশ,
ওরে দুর্বল-দল, অশ্রুর জল মোছ্ মোছ্ সত্বর,
দ্যাখ্ সৃষ্টির মাঝ মিশ্রিত্ আজ অন্তর সত্য'র।

আছে সত্যের প্রাণ স্পন্দনমান ছন্দের নাচ্নায়
আছে অম্বর-গায়, হিল্লোল-বায়, চন্দ্রের জোছনায়,

আছে 'পাল্কির গান' দেশ-কল্যাণ 'ঘর্ঘর চরকায়'
আছে 'শূদ্রের' সাথ, 'নওরোজ'-রাত, মর্মর ঝরকায়!

আজ নাই নাই খেদ, নাই বিচ্ছেদ, নাই শোক একতিল
তার সুর-খোশবায় মন-বন ছায় মশগুল দ্যাখ্ দিল,
সে যে আপ্‌নিই আজ সুর-খাম্বাজ বিশ্বের বীণ-লীন্,
তার হস্তের বীণ রয় রোক দীন—গানহীন গমগীন্!

আজ অজ্ঞাত এই সাগরেদ—দেই অশ্রুর ফুলহার
লও তুচ্ছের দান—বেদনার গান—বুলবুল বাংলার!

নিয়ন্ত্রিত

কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের 'বিদ্রোহী'কে লক্ষ্য করিয়া

ওগো 'বীর!'
সংযত করো সংহত করো 'উন্নত' তব শির!
'বিদ্রোহী?'—শুনে হাসি পায়!
বাঁধন-কারার কাঁদন কাঁদিয়া বিদ্রোহী হতে সাধ যায়?
সেকি সাজেরে পাগল সাজে তোর?
আপনার পায়ে দাঁড়াবার মতো কতটুকু তোর আছে জোর?
ছি ছি লজ্জা, ছি ছি লজ্জা!
তোর কোথা রণ-সাজ-সজ্জা?
তোর কোথা অনুচর অশ্ব পদাতি সৈন্য?
শুধু হাহাকার, শুধু আঁখি-ধার, শুধু দৈন্য!
তোর স্থান কোথা ওরে বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়াবার—
নিজ অধিকারে দাঁড়াবার আর শত্রু-সেনারে তাড়াবার?
নাই নাই তোর কিছু নাই—
এই বাঁধন কাটিয়া বাহিরে কোথাও দাঁড়াবার তোর ঠাঁই নাই—
ওরে ঠাঁই নাই!
তবে কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া বিদ্রোহী তুই হবি বল্?
ওরে 'দুর্মদ,' ওরে 'চঞ্চল!'
তোর হৃদয়ে-বাহিরে আঁধারে-আলোকে, নিখিল ভুবন মাঝারে
মুক্ত বাঁধন পথ ঘিরে ঘিরে রাজিছে হাজারে হাজারে!
তুই যতই প্রয়াস করিস্ আপন মনে ভাই,
সেই 'খেয়ালি বিধির' বাঁধন এড়ায়ে পাবিনে মুক্তি কোনো ঠাঁই।
সে যে অযাচিত দান করুণার,

সে যে স্নেহ-বিজড়িত চোখে চোখে রাখা
কল্যাণ-প্রীতি-ভালোবাসা-মাখা
স্নিগ্ধ-সরস পেলব পরশ
ঊষর জীবনে শতবার!
সে যে শুধু ক্ষমা আর ভুলে-যাওয়া,
সে যে মিলন-পিয়াসী মৌন নয়ন তুলে-চাওয়া!
সে যে পীযূষ-ফোয়ারা উচ্ছল-চল-কলকল,
চির নিরমল—চির ঢল-ঢল!
সে যে মলয়-অনিল রবির কিরণ স্নিগ্ধ-মধুর মনোরম,
সে যে শারদ-চাঁদিনী, কুসম-কামিনী, আকাশ-নীলিমা অনুপম
সে যে নিত্য-হরষা ঊষা-বালিকার গীতি-মুখরিত জাগরণ,
সে যে সবুজ পাতার মাথার উপরে কম্পন-ঘন-শিহরণ,
সে যে স্নিগ্ধ সলিল-লাস্য,
সে যে মিটি মিটি মিটি চেয়ে-থাকা কোটি
তারকার চারু হাস্য।
সে যে সুপ্তি সে যে শান্তি!
সে যে নয়ন-ভুলানো বিশ্ব-রানীর তনুর তনিমা-কান্তি,
সে যে আপনারি মাঝে আপন মনের অনুভূতি,
অতি দূর হতে যেন ভেসে-আসা কোন্
অজানা জনের তনু-দ্যুতি!
সে যে চাওয়ার বাসনা, পাওয়ার তৃপ্তি,
সফল আশার পুলক-দীপ্তি,
বিনিময়ে তার রিক্ত হিয়ার
দৈন্য-কাহিনী নিবেদন!
মরমে লুকানো কী বেদন!
সেই বাঁধন-কারার মাঝারে দাঁড়ায়ে
খালি দুটি হাত ঊর্ধ্বে বাড়ায়ে
তুই যদি ভাই বলিস্ চেঁচিয়ে—'উন্নত মম শির—
আমি বিদ্রোহী বীর'—
সে যে শুধুই প্রলাপ, শুধুই খেয়াল, নাই নাই তার কোনো গুণ,
শুনি স্তম্ভিত হবে 'নমরূদ' আর 'ফেরাউন'!
শুনি শিহরি উঠিবে 'শয়তান',—
হবে নাকো সে-ও সঙ্গের সাথী, গাবে নাকো তোর জয়গান!
তুই তার চেয়ে কিরে শক্ত,
তার চেয়ে কিরে ভক্ত?
ধ্বনি উঠে যে রণিয়া—না, না, ওরে না, না,
তুই তা না!

তুই দুর্বল—চির দুর্বল,
তুই পথের ধূলায় পড়িয়া আছিস্ কোথায় সে কতদূর বল্।
তুই যার সাথে ভাই বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়ালি,
তাহারই রসদে বাঁচিয়া আছিস
তাহারি রাজ্যে দাঁড়ায়ে নাচিস্
তাহারি হুকুমে মরিস্ বাঁচিস্
শুধু অভিশাপ কুড়ালি।
আপনার পায়ে আপনি হানিলি কুড়ালী!
ওগো বীর!
তবে সংযত করো, সংহত করো উন্নত তব শির!
বিদ্রোহী ওগো বীর!
হৃদয় মেলিয়া চেয়ে দেখ্ ভাই মন করি সুস্থির—
সবারে-এড়ায়ে-দূরে-চলে-যাওয়া বিদ্রোহ—সে কি সত্য?
যাহা হয়ে গেলি, তাই যে রে খাঁটি—কোথা পেলি এই তথ্য?
মিথ্যা—সে কথা মিথ্যা
বিদ্রোহ—সে যে শুধু ঠুকাঠুকি—নিজেরেই শুধু হত্যা?
মিছে বিদ্রোহী কেন হবি ভাই?
তাতে সুখ নাই, তাতে সুখ নাই।
বিদ্রোহ মাঝে শুধু হাহাকার, শুধু মিলনের তৃষ্ণা,
আলোক সেখানে হাসে না কখনো, শুধুই কালিমা-কৃষ্ণা।

যদি পেতে চাস্ কভু জীবনের সুধা উপভোগ,
তবে বিশ্বের সাথে আপনারে কর্ শুভযোগ,
তবে 'বিদ্রোহী' হতে বিদ্রোহী হ'রে, হৃদয় দুয়ার খুলে দে,
সেথা মহা-মিলনের উৎসব বসা, বক্ষে সবারে তুলে নে!
সেথা আসুক বেদনা, আসুক অশ্রু,—আসুক তুচ্ছ-অতি দীন
তুই বিশ্বের সাথে যোগ দিয়ে চল্ গান গেয়ে গেয়ে প্রতিদিন,
এই নিখিল জগতে আকাশে, হৃদয়ে, বাহিরে!
বিরোধ-ঝঞ্ঝা—বিদ্রোহ কোথা নাহি রে!

শুধু আছে যোগ, শুধু আছে প্রেম আর ভালোবাসা,
আপনার পথে অবাধ গতিতে যাওয়া-আসা;
চন্দ্র-সূর্যে তারায় তারায় আছে মিল,
সাগর-তটিনী, তরু-লতিকায় শুধু প্রেম চির অনাবিল,
গগনে গগনে জলদে চপলে গহনে.—
আকাশে পাতালে অনিলে অনলে দহনে,

আছে প্রেম, আছে মিলন-মাধুরী জড়ায়ে—
মিলনের গান গিয়াছে বিশ্বে ছড়ায়ে!
নাহি বিদ্রোহ, নাহি অনিয়ম, নাহি কোনো মানা,
জীবনের গতি, ভাগ্য-নিয়তি সকলেরি কাছে আছে জানা;
তারা আপনার মনে অবাধ গতিতে যে যাহার পথে চলে যায়,
পথে চলিতে চলিতে কোলাকুলি করে, মুখপানে সদা হেসে চায়!

এই সুন্দর-চির-উজ্জ্বল-চারু-চিত্র-বহুল বিশ্ব
এই শ্যাম শোভাময়ী নিতি নব নব দৃশ্য,
এ নহে শুধুই 'শোক-তাপ-হানা খেয়ালি বিধির' সৃষ্টি
পিছনে ইহার জেগে আছে তাঁর দিব্য আঁখির দৃষ্টি;
'শোক-তাপ?'
সে যে ভুল কথা ভাই, নাই নাই কিছু শোক-তাপ—
মানুষের শিরে নাহিকো খোদার অভিশাপ!
এই সৃষ্টির মূলে দুঃখেরও যে গো আছে ঠাঁই,
অতি ঊর্ধ্ব হইতে দৃষ্টি হানিলে দেখিবারে পাই সদা তাই;
তবে কেমন করিয়া বলিব—এ 'শুধু নিঠুর বিধির খেয়াল'?
কেমন করিয়া সুখ-দুখ মাঝে টেনে দিব ভাই দেয়াল?
ভুল, ভুল, তোর, সবি ভুল,
তুই সুধা নাহি পিয়ে বিষ হতে চাস—
'উন্মাদ' তুই বিলকুল!

তুই হবি কেন ভাই 'উন্মন মন উদাসীর?'
'বিধবার বুকে ক্রন্দন-রোল, হা-হুতাশরাশি হুতাশীর',
তুই হবি কেন ভাই গৈরিক-পরা পরম বিরাগী সৈনিক?—
ওরে নিত্য নূতন দৈনিক!
তুই অনুভূতি দিয়ে ব্যথিতের ব্যথা
আপনার বুকে এঁকে নে
'গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি' আকুল নয়নে দেখে নে।
তুই নব বধূটির শরম-জড়িত অধরের কোণে চুমো খা,
তার কুসুম-কোমল বক্ষের পরে মূর্ছিত হয়ে ঘুমো যা!
তুই কিশোরীর সাথে কিশোর হইয়া প্রাণ খুলে দিয়ে খেলা কর্,
অভিমান-ভরে ঠোঁট ফুলাইলে সোহাগ ঢেলে দে শির 'পর!
তুই 'যৌবন-ভীতু পল্লী-বালার' নয়নের পানে চেয়ে থাক্,
পালাইয়া যাক্ ত্রস্ত চরণে—মঞ্জরী-ধ্বনি বেজে যাক্!
তুই পথে যেতে যেতে ফাগুন-ঊষার রক্ত-আলোকে নদী-তীরে,

সদ্যস্নাতা সিক্ত-বসনা মুক্ত-চিকুর প্রেয়সীরে,
চলার গতিতে সহসা থমকি একবার দেখে চলে যা,
থাকে যদি কিছু বলিবার, তবে আঁখির ভাষায় বলে যা!
তুই ফুলবনে গিয়ে লুটে নে রে ফুল-সুরভি,
সাঁঝের বাতাসে তটিনীর কূলে গেয়ে যা উদাস পূরবী,
তুই বিশ্বের পানে অবাক হইয়া চেয়ে থাক্
তোর পরাণে কাহারো পুলক-পরশ লেগে যাক্,
তুই চারিদিক দিয়ে জীবনেরে কর্ সার্থক আর ধন্য,
এই নিখিল বিশ্ব সুষমায়-ভরা পাতা আছে তোর জন্য!

ওগো বিদ্রোহী বীর-সৈন্য,
হবি কিসের জন্য বিদ্রোহী তবে, কিসের অভাব দৈন্য?
তুই ধন্য, ওরে ধন্য,
তুই সৃষ্টির সেরা মানুষের শিশু—নহিস তুচ্ছ অন্য—
তুই ধন্য—তুই ধন্য!
ওগো বিদ্রোহী মহাবীর
তবে সংযত করো, সংহত করো
উন্নত তব শির!

বউ কথা কও

নব-মুকুলিত মাধবী-কুঞ্জে নীরব নিশীথ কালে
ডাকিতেছে পাখি 'বউ কথা কও' বসিয়া বকুল ডালে।
সারা দিনমান দারুণ দাহনে দগ্ধ হইয়া ধরা
এলায়ে পড়েছে নব ঘুমঘোরে, হৃদয় ক্লান্তি-ভরা।
ঝিল্লির তানে বন-উপবন মুখরিত অনিবার
সে যেন সুপ্ত নিশ্বাস-ধ্বনি বিশ্বের নাসিকার।
সুনীল গগনে জেগে বসে আছে শশী আর তারাদল,
পাতায় পাতায় হিরণ-কিরণ করিতেছে ঝলমল।
তপন-তাপেতে ঝলসিত-কায় আদুরী বিশ্বরানী
শুয়ে আছে যেন মার আঁখি-তলে এলাইয়া তনুখানি।
সারাদিন ধরি অগ্নি-তপন যে জ্বালা দিয়াছে তার
চুম্বন করি জননী সেখানে ঘুচাইছে ব্যথা-ভার!
সোহাগ-পরশে হরষে মাতিয়া কচি কিশলয়গুলি
তাই বুঝি আজি শিশুর মতন উঠিতেছে দুলি দুলি।

এমনি নীরব মৌন নিশীথে গাহিতেছে পাখি গান,
ও কি গান? না, না, গাহে কি সে গান ভেঙে গেছে যার প্রাণ?
ও যে অভাগার আকুল রোদন নীরব কুঞ্জ-মাঝে,
বেদন-জড়িত রোদন ধ্বনিরে গান বলা কি গো সাজে?
নিঠুর দুনিয়া হেথায় কোথাও প্রাণের দরদী নাই,
অশ্রুর মাঝে মুক্তার শোভা দেখিতে শিখেছে তাই!
কান্নার রোলে সুর খোঁজে এরা, বেদনাতে উল্লাস,
পঙ্গু পতিত ব্যথিতেরে দেখে করে সবে উপহাস।
এসো এসো পাখি, মরমের কথা শুনাও আমারে সবি,
তব তরে আজ বসে আছে এই বিরহ-ব্যথার কবি।

পাখি, তুমি বলো—কেন কাঁদো তুমি 'বউ কথা কও' সুরে?
কিসের বেদনা গুমরিয়া ফিরে তোমার মর্ম-পুরে?
কোন্ কাননের মেয়ে সে কাহার, কেমন ছিল সে বউ?
ছিল কি দেখিতে ফুলের মতন, বুকভরা তার মউ?
হৃদয় ঢালিয়া তাহারে কি তুমি বেসেছিলে বড় ভালো?
আধারের মাঝে ছিল কি সে তব জীবনের ধ্রুব আলো?
পরান-জুড়ানো অমিয়-মাখানো ছিল কি তাহার বুলি?
অধরে মধুর হাসিটি লয়ে কি চাহিত সে আঁখি তুলি?
নীল গগনের সীমাহীন পারে বেড়াতে কি দুই জনে
ভুলে যেতে কি গো জগতের কথা নব প্রেম-আলাপনে?
নয়নে নয়নে হাসিয়া চাহিয়া মুগ্ধ অলস চিতে
ঘন চুম্বনে প্রেয়সীরে কি গো আকুল করিয়া দিতে?
এমনি শুভ্র মধু-যামিনীতে ফুলের শয়ন পাতি
কুসুম কাননে জাগিয়া থাকিয়া কাটাতে কি সারা রাতি?
বলো বলো পাখি, গোপন কথাটি বলো আজি মোর কাছে,
কী আশা তোমার মেটেনি জীবনে, কী ক্ষুধা জাগিয়া আছে!
কোন্ সে কথার না-শোনা ব্যথায় হিয়া তব তীর-হানা,
নারী হৃদয়ের কোন্ রহস্য এখনো হয়নি জানা?
হায় পাখি, আমি বুঝি নাকো—তুমি কী গভীর ব্যথা নিয়া
যুগ যুগ ধরি কাঁদিয়া চলেছ বনের আড়াল দিয়া।
সে কথা ভাবিয়া আজি এ নিশীথে আমারো যে কাঁদে প্রাণ,
বেদনার ভাষা সবার প্রাণেই করে যে বেদনা দান।

প্রণয়ের পথ নহে সমতল—তৃণাস্তরণে ঘেরা,
বিরহ হেথায় কড়া পাহারায় পাতিয়াছে চির ডেরা।

বাধা-বন্ধন পদে পদে আসে, পূরে নাকো মন-সাধ,
পরিজন মাঝে গুরুজন যারা তারাও সাধে যে বাদ।
গতানুগতির পথ বেয়ে চলে সমাজ-শাসন মানি,
স্বার্থেরে দেয় উচ্চ আসন প্রেমের উপরে আনি!
তরুরে ঘিরিয়া বেড়েছে যে লতা তাহারে ছিঁড়িয়া নিয়া
নূতন তরুর জীবনের সাথে দেয় তারে জড়াইয়া।
তোমারো কি তাই ঘটেছে জীবনে, মিটেনি মনের আশা?
মুকুলেই কি গো ঝরিয়া গিয়াছে যত সাধ-ভালোবাসা?
রানীর আসনে বরণ করিয়া রেখেছিলে হৃদে যারে
হয়েছে কি দিতে বাহির করিয়া আপনার হাতে তারে।
হয়তো তোমার প্রেয়সীর মুখে একটি কথার লাগি
সারাটি জীবন ব্যর্থ হয়েছে, বেদনার দাগে দাগী।
প্রিয়া সে রমণী, বুক ফাটে তবু মুখে নাহি ফোটে কথা,
নীরবে সহিছে কোন্ গৃহকোণে সে গভীর মনোব্যথা।

হায়রে অবলা রমণী-হৃদয়! এত দুর্বল তোরা,
কোনো দিন তোরা কথা কহিলি না? ওরে ও বর্ণচোরা!
হৃদি-কুঞ্জের কুসুম তুলিয়া এত মালা গাঁথাগাঁথি
পায়ের তলায় দলিয়া যায় যে খেয়ালি পুরুষ জাতি।
তবু চিরদিন নীরব রহিলি? দাঁড়ালি না মাথা তুলি?
বাধা যত ব্যথা, মুখে তার যদি ভাষা দিতি এক কণা,
বিশ্বের বুকে এত ব্যথা তবে সঞ্চিত হইত না।
কত হৃদয়ের অপূরিত সাধ মিটিত মিলন-সুখে,
স্বর্গ আসিয়া ধরা দিত তবে কত বিরহীর বুকে!
ডাকো ডাকো পাখি, এমনি করিয়া যুগে যুগে তুমি ডাকো,
নিখিল নারীর মৌন বেদনা মুখর করিয়া রাখো।
যে ব্যথা সহিয়া রয়েছে গোপনে তোমার লাজুক প্রিয়া,
তুমি বেঁচে থাকো যুগে যুগে সেই মর্ম-বেদনা নিয়া।
যে কথা সে কভু পারেনি বলিতে, তুমি তারে দাও ভাষা,
অমর করিয়া রাখো বেদনায় সে অসীম ভালোবাসা।
বিরলে বসিয়া হৃদয় খুলিয়া নীরব কক্ষ-তলে
ঘরে ঘরে যবে নিপীড়িতা বধূ তিতিবে অশ্রুজলে,
তুমি দূর হতে চিৎকার করি কহিও তাহার দুখে—
'বউ কথা কও, চিরদিন আর থেকো না মৌন মুখে।'

থেমে গেল গান। উড়ে গেল পাখি কোন্ দূর পরপার;
নীরব প্রকৃতি, স্তব্ধ আকাশ, নির্জন চারিধার।

মনে হল—এ তো পাখি নয়! এ যে প্রকৃতির বুক মাঝে
চির বিরহের সঞ্চিত ব্যথা সুর হয়ে আজি বাজে।

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী।
যত গুণগান, হে চির-মহান,
তোমারি অন্তর্যামী ॥

দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি কাছে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি কাছে যাচি হে শকতি,
তোমারি করুণাকামী ॥

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
মোদেরে দাও গো বলি
চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার
প্রিয়জন যায় চলি।

যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ
যে-পথে ভ্রান্তি চির-পরিতাপ
হে মহাচালক, মোদেরে কখনো
কোরো না সে-পথগামী ॥

কবির প্রেম

আমি তোমারে চাহি না পেতে, হে প্রিয়তমা,
দীন ভিখারীরে দান-দেওয়া করুণা সমা।
মোর প্রেম নহে হীন
নহে দুর্বল—ক্ষীণ,
কারো মুখ চেয়ে রয় না সে ব্যথা-বিমলিন,
কারো অনাদর-অবহেলা করে না ক্ষমা।

তার আপনার শক্তিতে আপনি সে লীন,
নব সৃষ্টির উল্লাসে পরান রঙিন্;
তার প্রাণ যারে চায়
তারে সহজে সে পায়,
কারো সাধ্য সে নাই হেন বাধা দিতে তায়,
নহে স্রষ্টা-সমাজ-প্রিয়া—কারো সে অধীন!

কভু কারো কাছে হাত পেতে চাব না তোমায়,
আমি তোমারে রচিব মোর আপন হিয়ায়!
শুধু নহে বিধাতা
তব জন্মদাতা!
যদি ভুল বুঝে থাকো, তবে ভোলো সে কথা,
পারে কবিও সৃজিতে তার পরাণ-পিয়ায়!

তুমি জন্মিবে মোর হাতে নিয়ে নব রূপ—
চির সুন্দর অনুপম শোভা অপরূপ।
ছিলে এক-দেহপ্রাণ
এবে হবে দুইখান,
তার একখানি মৃন্ময়ী—বিধাতার দান,
আর একখানি কবি-কল্পনা—সে অপরূপ।

বিধি মাটি ছানি গড়িয়াছে তব মূরতি—
আমি তোমারে গড়িব সখি ছানিয়া জ্যোতি!
ওই হাসিমাখা মুখ,
ওই পুষ্পিত বুক,
ওই নধর অধর দুটি রাঙা টুক্‌টুক্—
আমি রচিব আপন হাতে যতনে অতি।

দিব ফুল দিয়া সাজাইয়া ও তনুখানি
চির ফুল-ভালোবাসা মোর হে ফুলরানী!
দিব বকুলের হার
কালো অলকে তোমার
দিব কানে দুলাইয়া দুল ঝুম্‌কো-লতার।
দিব চরণ রাঙিয়া রাঙা মেহদী আনি!

তুমি যেথায় বিধির-গড়া, সেথা অতি দীন,

ওই রূপ-যৌবন নাহি রবে চিরদিন!
ওই স্থূল দেহখান—
ওর হীন উপাদান,
ওর পদে পদে বন্ধন করে বাধা দান,
ও যে ধরণীর পিঞ্জরে পাখি গতিহীন!

আমি রচিব তোমার যেই নব মূরতি,
হবে চির-সুন্দর সে যে চির-যুবতী!
তার রূপ-যৌবন
নাহি শুকাবে কখন,
নাহি দেশ-কাল-পাত্রের বাধা-বন্ধন,
হবে পরীর মতন তার সহজ গতি।

তুমি বিধির সৃজিত হয়ে মরিবে—সে ঠিক,
কভু রাখিবে না বাঁচায়ে সে তোমারে অধিক!
আর আমি যে-জীবন
তব করিব সৃজন,
সে যে অমর ধরায়—তার নাহিকো মরণ,
কাল চেয়ে রবে তার পানে আঁখি-অনিমিখ্।

সেই আমারি হাতের-গড়া তোমারে নিয়া
আমি জুড়াব বিরহ-ব্যথা—বিধুর হিয়া।
মোর মনের কোণে
অতি সংগোপনে
হবে নব প্রেম-পরিণয় তোমার সনে,
আমি বধূবেশে লব তোমা হৃদে বরিয়া।

মোর কল্প-লোকের প্রেম-কুঞ্জবনে
হবে মধুমিলনোৎসব সংগোপনে!
সেথা হবে অনুখন
কত প্রেম-আলাপন,
হবে বিরলে বসিয়া কত কপোত-কূজন,
শুধু তুমি-আমি রবো সেই নবভুবনে।

সেথা শ্যামল কানন-তল কুসুম-ছাওয়া,
বহে হেনার সুরভি-মাখা মধুর হাওয়া!

সেথা ফুল-বীথিকায়
ঝর-ঝর্না-ঝোরায়
মোরা কাটাইব চিরকাল সুখে দুজনায়—
চির উচ্ছল যৌবন-পরশ-পাওয়া!

সেথা কত খেলা দুইজনে খেলিব বেভুল—
যথা ফুল-কুমারীর সনে খেলে বুল্‌বুল্‌!
হাতে পিয়ালা রাখি
কাছে আসিবে সাকি,
নিয়ে অধরে মধুর হাসি—চটুল আঁখি,
সেই শিরীন শরাবে হবে দিল মশ্‌গুল্‌।

যবে ভুবন ভাসিয়া যাবে জোছনা-ধারে,
মোর সোনার তরীতে তুলি লব তোমারে।
যার গগনের শেষ
কোন্‌ স্বপনের দেশ,
যাব নীহারিকা-লোকে ধরি অপরূপ বেশ,
যাব ভেসে ভেসে অসীমের সাগর-পারে।
তুমি হইবে এমনি মোর জীবন-সাথী
নিতি শয়নে স্বপনে ধ্যানে দিবস-রাতি
মধু-গন্ধ যেমন
রচে ফুলের জীবন,
হবে তব সাথে সেইমতো আমারো মিলন,
তব খোশ্‌বু'তে দিল্‌ মোর রহিবে মাতি।

মিছে সোনার শিকল তব পরাল কে পায়?
কেন বন্দিনী করে দূরে রাখিল তোমায়?
হায় এ কী দুরাশা
দূরে যাওয়া-কি-আসা
কভু ভুলাতে কি পারে কারো প্রেম-পিয়াসা?
প্রেম সব বাধা-বন্ধন দলে চলে যায়!

মোর প্রেম সে রাহুর মতো রয়েছে ঘিরে
তব চাঁদমুখখানি সারা গগন-তীরে!
কোথা পালাবে প্রিয়া
দূরে আড়াল দিয়া?
কোথা রাখিবে কে লুকাইয়া তোমারে নিয়া?
আছে কবির প্রেমের শাপ তোমার শিরে!

কবির আঁখি

কবির আঁখি দুটি, চাহনি মিটি-মিটি
উহারে এড়ায়ে চলিবে সব দিঠি,
ও আঁখি সোজা নয়, —দুষ্ট অতিশয়!
উহারে বিশ্বাস করাটা ভালো নয়!

দৃষ্টি ভাষা আর শ্রবণে মনে মনে
করিছে আনাগোনা কবির আঁখি কোণে,
আঁখিতে দেখে শোনে, আঁখিতে কথা কয়
এই তো সবচেয়ে মুস্কিল—বেশি ভয়!

যে কথা ফোটে নাকো ভাষার গুঞ্জনে
হৃদয় জাগে ভালোবাসার মুঞ্জনে,
সেখানে কবি শুধু বারেক আঁখি ঠারে
যা কিছু বলিবার পারে তা বলিবারে;—

সে শুধু চোখে-চোখে কেবলই চেয়ে থাকা
হৃদয় টেনে আনি আঁখিতে পেতে রাখা,
না বলি কোনো কথা বচনে বারবার
হিয়াটি তুলে ধরা নয়নে আপনার!

সদ্য স্নাত-বাসে কলসি লয়ে কাঁখে
তরুণী থেমে যায় সহসা পথ-বাঁকে,
আঁখিতে আঁখি মিলি শিহরি উঠে কবি,
নিমেষে প্রীতি-প্রেম জানায়ে দেয় সবি!

কী-যে-কী চাহনি সে বলিতে পারা ভার—
চপলা চঞ্চলা আলোক-কারাগার!
আঁখির ফাঁদ পাতি নিখিল ধরা মাঝে,
কবির মন-চোর ব্যাধের মতো রাজে!

শুনিতে পারে কবি বুকের চাপা ব্যথা
বদনে যত থাক্ মৌন নীরবতা;
কথার ছবি যেন এঁকে নেয় আঁখি তার
নয়নে ধরে আনে মুরতি বেদনার!

প্রণয়-প্রীতি-ভরা বাসর ফুল-সাজে
আধেক-মুকুলিত প্রিয়ার হৃদি-মাঝে
যে কথা জেগেছিল, কেহ কি বলে তাই!—
কবির চোখে তাও ধরিতে বাকি নাই!

তীক্ষ্ণ সূচি-ভেদী কবির আঁখি-তারা
কোথাও বাধা নাই—হয় না দিশেহারা,
সেখানে যতটুকু মাধুরী পড়ে রয়
মরাল সম সে যে আঁখিতে ধরে লয়।

সাগর-তটিনীতে গহনে ফুল-বনে
গোপনে কোন্ বাণী বলে কে মনে মনে,
আকাশে ধরাতলে নিতি যে গীতি বাজে,
সবারি ছায়া পড়ে কবির আঁখি মাঝে।
পারে সে দেখিবার অজানা কত দেশ
গগন-সীমা-রেখা নহেকো তার শেষ,
অসীম নীলিমার ওপারে পলে পলে
কবির কুতূহলী আঁখির খেয়া চলে!

কবির আঁখিদুটি যাহারে ভালোবাসে,
মরতে তার কাছে স্বরগ নেমে আসে!
অমন প্রেমভরা আঁখির চাওয়া দিয়ে
কেহ কি বাসে ভালো, বলো তো বলো প্রিয়ে?

সন্ধ্যারানী

সন্ধ্যারানী! সন্ধ্যারানী!
এই যে মোদের গোপন মিলন—কেউ জানে না আমরা জানি।
পশ্চিমের ওই গগন-কোণে
এলে তুমি সংগোপনে
উড়িয়ে দিয়ে মৃদুল বায়ে রেশমি মেঘের আঁচলখানি।

রক্ত-রাঙা মুখের পরে অসীম-ছাওয়া ওই-যে নীলা,
ও তো তোমার এলিয়ে দেওয়া মুক্ত কেশের সহজ লীলা,
শান্ত নদীর মুকুর তলে,

দেখছ কি মুখ কৌতূহলে?
সীমন্তে কে পরিয়ে দিল হীরক-টিপ ওই কখন আনি?

তোমায় আমায় এমনি করে নদীর ধারে নিতুই দেখা,
লক্ষ লোকের চোখের তলেও আমরা দুজন একা-একা!
তোমায় আমি ওগো প্রিয়া,
ভালোবাসি হৃদয় দিয়া,
শুনেছি গো তোমার মুখে ভালোবাসার মৌন বাণী!

রক্ত-রাগ

হৃদ-গগনের পূর্ব-দ্বারে ছড়িয়ে গেল রক্ত-রাগ,
জানি না এ হাল্‌কা রঙের ভেল্‌কি কিবা শক্ত দাগ;
এই রাঙিমার পিছন দিয়ে অরুণ-রবি উঠবে কি?
টুটবে আঁধার, ফুটবে হাসি—পুলক-ধারা ছুটবে কি?

হাস্নাহেনা

রূপ-গরবী নয় এ গোলাপ—হাওয়ার দোলায় দোদুল-দোলা,
স্বাধীন দেশের মেয়ের মতন অসঙ্কোচে ঘোম্‌টা-খোলা।
নয়কো চাঁপা, নয় করবী—কানন-রানীর নগ্ন মেয়ে,
আপন শোভায় সজাগ হয়ে পথের ধারে রয় না চেয়ে!
লক্ষ্মী মেয়ে যুঁথিও নয়—ছোট্ট তবু চতুর অতি
গৃহিণীদের মতন শুধুই মন রয়েছে ঘরের প্রতি!
নয়কো বেলী, নয় কামিনী, শ্বেত বিধবার বসন-পরা,
ফুল-বালিকা শেফালিকাও নয় এ হাসি-অশ্রু-ঝরা!
কমল-কুমুদ—তাও নহে এ—সমাজ-থেকে-বেরিয়ে-যাওয়া,
কুলটাদের মতন নিতুই পরদেশীদের পরশ পাওয়া!
—মনের কোণের আঙিনাতে ফুটেছে এই হাস্নাহেনা
পল্লী-বধূর মতন মধুর, বাইরে এরে যায় না চেনা।
দিনের আলোয় রয় সে গোপন, মুখ তুলে সে কয় না কথা,
সবুজ পাতায় ওড়না-ঢাকা লজ্জাবতী এ কোন্ লতা!
শুভ্র-শুচি মনটি তাহার, প্রেম করে না সবার সনে,
হৃদয়-দুয়ার দেয় না খুলে প্রভাত-অলি গুঞ্জরণে!

আলোক যখন বিদায় মাগে অস্ত-রবির রক্তরথে
সন্ধ্যারানী আঁচলখানি উড়িয়ে চলে পল্লীপথে,
মুখর ধরা স্তব্ধ যখন, কুঞ্জ ঘেরা আঁধার-জালে—
হাস্নাহেনার প্রেম-অভিসার সেই আঁধারের অন্তরালে!
বুকের মুখের লাজ-আবরণ তখনি তার যায় যে খুলে,
মিলন আশায় উছলে ওঠে যে সুধা রয় মর্মমূলে!
কোন্ পথে তার প্রেমিক আসে, কোন্ বনে সে আসন পাতে,
কোন্খানে এই দুইটি হিয়ার মিলন যে হয় নিত্য রাতে,
সেই মিলনের গোপন বাণী এই ধরণীর কেউ না জানে—
পথিক হাওয়া শুধুই তাহার নগ্নদেহের গন্ধ আনে।

ফাতেহা-ই-দোআজদহম

আবির্ভাবে

হে রসুল! আজি তব শুভ জন্ম-উৎসবের দিনে
যে সুর উঠিল বাজি অনাহত মোর মনোবীণে,
তাহারে ধরিয়া লব জানি নাকো কোন্ বাণী দিয়া,
সারা চিত্ত ছন্দে-গানে উঠিয়াছে ব্যাকুল হইয়া!
আজিকার এই পুণ্য-প্রভাতের উৎসব-লগনে
আমার সমগ্র প্রাণ ছুটে গেছে আরব-গগনে,
ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্ধকার-যবনিকা ঠেলি
উদয়-শিখর পানে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টি মেলি;
হেরিছে তোমার সেই আগমনী-মহামহোৎসব,
শুনিতেছে দিকে দিকে অবিরাম হর্ষ-কলরব।
কী আনন্দ-কলরোল উঠিয়াছে আকাশে ভুবনে,
এ দিন কখনো যেন আসে নাই ধরার জীবনে!
আকাশ দিয়াছে তার রক্ত-রাঙা অরুণ-কিরণ
বেহেশ্তের সুধা-গন্ধ আনিয়াছে মৃদু সমীরণ;
ছুটাছুটি করিতেছে দিকে দিকে ফেরেশ্তার দল,
সারা চিত্ত তাহাদের আজি যে গো পুলক-চঞ্চল!
এসেছে 'হাজেরা' বিবি, আসিয়াছে বিবি 'মরিয়ম'
আমিনার গৃহে আজি বেহেশ্তের শোভা অনুপম!
দিকে দিকে উঠিতেছে নব ছন্দে বন্দনার গান—
'স্বাগতম্! স্বাগতম্ ধরণীর হে চির কল্যাণ!'

হোথা ওই অন্ধকার লাঞ্ছনার গুরু বেদনায়
নীরবে আপন মনে কোন্ দূরে পালাইয়া যায়!

'লাৎ' 'মানাতের' প্রাণ কেঁপে ওঠে মুহুর্মুহু আজি,
পারশ্যের অগ্নি শিখা থেমে যায়। বাঁশি উঠে বাজি!—
অন্ধকার আজি হতে চিরতরে লইল বিদায়,
আলোকের রাজ্য-পাট প্রতিষ্ঠিত হল দুনিয়ায়;
মরে গেল যত ব্যথা, যত মিথ্যা, যত পাপ-তাপ,
যত ভুল, যত ভ্রান্তি—জীবনের যত অভিশাপ!
সত্য আজি পাতিয়াছে সারা বিশ্বে নূতন স্বরাজ,
সুন্দর ও মঙ্গলের জয়যাত্রা শুরু হল আজ!

ওরে ভ্রান্ত পথহারা! ভয় নাই, ভয় নাই তোর,
আঁখি মেলে চেয়ে দ্যাখ্—অমানিশা হইয়াছে ভোর!
আসিয়াছে বন্ধু তোর হাত ধরি তুলে নিতে বুকে,
কাঁদিতে এসেছে সে যে ব্যথিত ও লাঞ্ছিতের দুখে!
উঠে আয়, ছুটে আয়, নিরাশায় হোস্‌নে রে লীন,
আজি যে রে ব্যথিতের সবচেয়ে আনন্দের দিন!
আজি যে রে সারা বিশ্বে মানুষের মুক্তির উৎসব,
মহা-মানুষের আজি আবির্ভাব—ধরার গৌরব!

হে রসুল! আজিকার এই পুণ্য প্রভাত-আলোকে
তোমারে সালাম করি দূর হতে পরম পুলকে!
উৎসবের মাঝে আজি এই কথা যেন নাহি ভুলি—
তুমি শুধু করো নাই ধন্য এই ধরণীর ধূলি,
পুণ্য-প্রেম, শান্তি-প্রীতি—ইহারাও তব সাথে সাথে
জনম লভেছে আজ এই পুণ্য আলোক-প্রভাতে!
জাগিয়া উঠুক আজি এই দিনে আমাদের মনে
কী অসীম শক্তি আছে লুকাইয়া মানব জীবনে!
একটি জীবন যদি জেগে ওঠে সত্য-সাধনায়,
কিরূপে তাহার তেজে সারা ধরা লুটে তারি পায়!
কিরূপে বাঁধন টুটে সাধকের চরণের তলে—
কিরূপে সত্যের রথ আপনার পথ কেটে চলে!

হে নিখিল ধরাবাসী! মুসলিমের লহ নিমন্ত্রণ,
এ উৎসব নহে শুধু আমাদের একান্ত কখন্!
নাসারা খৃস্টান এসো, এসো বৌদ্ধ-চীন,
মহামানবের এ যে পরিপূর্ণ উৎসবের দিন!

ঈদ-উৎসব

আজিকে আমাদের জাতীয় মিলনের পুণ্য দিবসের প্রভাতে
কে গো ঐ দ্বারে দ্বারে ডাকিয়া সবাকারে ফিরিছে বিশ্বের সভাতে!
পুলকে সদা তার চরণ চঞ্চল
উড়িছে বায়ু-ভরে বসন-অঞ্চল,
সকল তনু তার শুভ্র-সুকুমার, স্নিগ্ধ স্বরগের আভাতে।

কণ্ঠে মিলনের ধ্বনিছে প্রেম-বাণী, বক্ষে ভরা তার শান্তি,
চক্ষে করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতি-ভার, বিশ্ব-বিমোহন কান্তি,
প্রীতি ও মিলনের মধুর দৃশ্যে
এসেছে নামিয়া সে নিখিল বিশ্বে,
পরশে সবাকার ঘুচেছে হাহাকার বিয়োগ-বেদনার শ্রান্তি।

বিগত সন্ধ্যায় আকাশ দরিয়ায় শ্যামলা পল্লীর 'পর সে
শুভ্র রজতের তরণী বেয়ে বেয়ে ভিড়েছে ধরাধামে হর্ষে,
সবার ঘরে ঘরে বিভাগ জন্য
তরণী ভরিয়া সে এনেছে পণ্য
সকল দীনতার তৃপ্তি হল স্নিগ্ধ-পুলকিত পর্শে!

এনেছে নব-গীতি, এনেছে সুখ-স্মৃতি, এনেছে প্রেম-প্রীতি-পণ্য,
এনেছে নব-আশা, একতা-ভালোবাসা, নিবিড় মিলনের জন্য,
ভ্রাতৃ-প্রণয়ের মহান দৃশ্য!
মিলন-কলগানে মুখর বিশ্ব!
বিভেদ-জ্ঞান যত আজিকে সব হত, ধন্য ঈদ তুমি ধন্য!

আজি—
সারাটি ধরামাঝে বাঁশরী বাজিয়াছে, জেগেছে প্রাণে নব ছন্দ,
উতলা সমীরণে আনিছে ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া নন্দন-গন্ধ,
নেমেছে ধরণীতে স্বরগ-বিত্ত
পুলকে ভরে গেছে সকল চিত্ত,
এসো হে নরনারী, সেবো সে সুধা-বারি, ঘুচায়ে হিংসা ও দ্বন্দ্ব।

অদূরে ওই শোনো পশিছে অনুখন মিলন-আবাহন কর্ণে,
আয়রে যত ভাই, মিলিতে ছুটে যাই, সাজিয়া নব-বেশ-বর্ণে!
ছুটিয়া এসো সবে মিলন-রঙ্গে
মিলিতে হবে আজি সবার সঙ্গে
মিলিতে হবে আজি ভিখারি-সুলতানে, হীরকে, স্বর্ণে ও পর্ণে।

আজি—
সকল ধরামাঝে বিরাট মানবতা মূরতি লভিয়াছে হর্ষে,
আজিকে প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগিয়াছে, রাখিতে হবে সারা বর্ষে;
এ ঈদ হোক আজি সফল ধন্য
নিখিল-মানবের মিলন জন্য,
শুভ যা জেগে থাক্, অশুভ দূরে যাক্, খোদার শুভাশিস্ পর্শে।

হে খুদা দয়াময়

হে খুদা দয়াময় রহ্‌মান-রহিম।
হে বিরাট, হে মহান, হে অনন্ত অসীম ॥

নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি
তুমি নিত্য ও সত্য পবিত্র অতি
চির-অন্ধকারে তুমি ধ্রুব জ্যোতি
তুমি সুন্দর মঙ্গল মহামহিম ॥

তুমি মুক্ত স্বাধীন বাধা-বন্ধনহীন
তুমি এক তুমি অদ্বিতীয় চিরদিন
তুমি সৃজন-পালন-ধ্বংসকারী
তুমি অব্যয় অক্ষয় অন্ত-আদিম ॥

আমি গুনাহ্‌গার, পথ অন্ধকার
জ্বালো নূরের আলো নয়নে আমার
আমি চাই না বিচার হাশরের দিন
চাই করুণা তোমারি ওগো হাকিম ॥

নিখিলের চির-সুন্দর সৃষ্টি

নিখিলের চির-সুন্দর সৃষ্টি
আমার মুহাম্মদ রসুল।
কুল্-মাখ্‌লুকাতের গুল্‌বাগে
যেন একটি ফোটা ফুল ॥

নূরের রবি যে আমার নবী
পুণ্য-করুণা ও প্রেমের ছবি
মহিমা গায় তারি নিখিল কবি
কেউ নয় তার সমতুল ॥

পিয়ারা নবী যেই এল দুনিয়ায়
হাসিল নিখিল আলোক-আভায়
পুলক লাগিল তরু ও লতায়
খুশিতে সবাই মশ্‌গুল ॥

আঁধার রাতে সে যে চাঁদের কিরণ
মরু-সাহারার বুকে সুধা-বরিষণ
নীরব ধরার গুল্‌বাগিচাতে যেন
গান গেতে এল বুল্‌বুল্‌ ॥

তুমি যে নূরের রবি

ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রসুল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
সালাওয়া তুল্লাহ্‌ আলাইকা ॥

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি ॥

চাঁদ-সুরুয আকাশে আসে
সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে ॥

তোমারি নূরের আলোকে
জাগরণ এল ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল
হাসিল কুসুম পুলকে ॥

নবী না হয়ে দুনিয়ার
না হয়ে ফেরেশ্‌তা খোদার
হয়েছি উম্মত তোমার
তার তরে শোকর হাজারবার ॥

মানুষ

সৃষ্টির প্রথম যুগ। মহাশূন্য মাঝে
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা নিজ নিজ কাজে
আসে যায় নিশিদিন। নিখিল ধরণী
ফল-পুষ্পে সুশোভিত বিচিত্র-বরণী
চেয়ে আছে ঊর্ধ্বমুখে। নাহি লোকালয়,
শুধু জীবজন্তু আর ফেরেশতানিচয়
করে হেথা বিচরণ। নবগৃহপ্রায়
এ ধরণী যেন কার আসা প্রতীক্ষায়
বসে আছে স্থির-নেত্র।

অন্তরীক্ষে থাকি
কহিলেন খোদা সব ফেরেশ্‌তারে ডাকি,—
'শোনো ফেরেশ্‌তারা, আমি দুনিয়ার পরে
অপূর্ব নূতন এক জীবন সৃষ্টি তরে
করেছি মানস। 'আদম' তাহার নাম
তারি মধ্য দিয়া আমি মোর মনস্কাম
পূর্ণ করে নিতে চাই। সে হবে আমার
একমাত্র প্রতিনিধি; দেহ হবে তার
দুনিয়ার মৃত্তিকায়, আত্মা হবে নূর,
আমারি জ্যোতিতে তার চিত্ত ভরপুর
হয়ে রবে নিশিদিন। নিখিল সৃষ্টির
সার সৃষ্টি হবে সেই। সে হইবে বীর—
সে হইবে রাজপুত্র সারা ধরণীর—
কারো কাছে নত নাহি হবে তার শির।'

ক্ষুব্ধচিত্তে ফেরেশ্‌তারা কহিল তখন—
'হে মহান! কেন মিছে করিবে সৃজন

আদমেরে? তারা গিয়ে দুনিয়া মাঝারে
দ্বন্দ্ব-কোলাহল আর শত অত্যাচারে
ধরণীরে করিবে পীড়িত! মোরাই তো সদা
করিতেছি সেবা তব!'

কহিলেন খোদা—
'শান্ত হও ফেরেশ্‌তারা, কোরো না ভাবনা,
আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানো না।'

অপূর্ব সুন্দর এক মানব-মূরতি
সৃজিলেন খোদাতালা। নবরূপজ্যোতি
বিচ্ছুরিত অঙ্গে তার; যেন মনে হয়—
প্রকৃতির মূলীভূত উপাদানচয়
সে মূর্তির মাঝে আসি পাইয়াছে ভাষা,
মিটিয়াছে আজি যেন যার যত আশা।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আকাশ-বাতাস
আজি যেন পেল কোন্ গোপন আভাস,
পরিপূর্ণ সার্থকতা জীবনে তাদের
আজি যেন দিল দেখা!

ডাকি সবে ফের
কহিলেন খোদাতালা—'এই সে আদম
নিখিলের সার সৃষ্টি—শ্রেষ্ঠ অনুপম,
ইহারে সালাম করো।'

শুনি সে আদেশ
তামাম ফেরেশ্‌তা-জিন ধরি ফুল্লবেশ
প্রণতি করিয়া ধীরে আদমের পায়
শ্রদ্ধাঞ্জলি করিল প্রদান।

শুধু হায়
অভিমানী 'আজাজিল'—ফেরেশ্‌তার নেতা
নোয়াল না শির তার। দাঁড়াইয়া সেথা
কহিল সে—'আমি কেন করিব সালাম
আদমেরে? কে শুনেছে কবে তার নাম?
তুচ্ছ হীন মৃত্তিকায় গড়িয়াছ যারে,

আমি ফেরেশ্‌তার নেতা—আমি কি তাহারে
সালাম করিতে পারি? কখনোই নয়।
তার চেয়ে আমি বড়—আমি অগ্নিময়।'

শুনি সেই দর্পভরা বিদ্রোহের বাণী
কহিলেন খোদাতালা—'হায় মূঢ় প্রাণী!
এত বড় স্পর্ধা তব? এত অহঙ্কার?
লও তবে বিদ্রোহের যোগ্য পুরস্কার—
আজি হতে নাম তব হল 'শয়তান',
তোমার অন্তর-ভরা দম্ভ-অভিমান
কলঙ্কের মালা হয়ে কণ্ঠদেশ তব
আঁকড়ি রহিবে সদা! এই অভিনব
শাস্তি আমি দিনু তোমা।'

—দেখিতে দেখিতে
নেমে এল কণ্ঠে তার সহসা চকিতে
কালো কলঙ্কের হার। মূর্তিখানি তার
মলিন হইয়া গেল; সব জ্যোতিভার
অঙ্গ হতে গেল খসে; লাজ-অপমানে
হেঁট হয়ে গেল মুখ। আদমের পানে
চাহিল সে শ্যেন-দৃষ্টি দিয়া। সদ্য-জ্বালা
প্রতিহিংসা-বাসনার তীব্র বহ্নিমালা
ছেয়ে গেল অঙ্গে তার। ক্ষুব্ধ প্রাণে
কহিল সে—'এয় খোদা, তোমার এ দানে
আমি খুশি হনু; শুধু নিবেদন মোর—
যার লাগি পেনু আজি এ-লাঞ্ছনা ঘোর,
সেই মানুষেরে আমি সকল প্রকারে
খর্বতা-সাধন যেন পারি করিবারে—
এই শক্তি দাও মোরে! যেন তারে আমি
পরীক্ষা করিয়া নিতে পারি দিনযামী
কিসে তার স্থান এত উচ্চ গরীয়ান—
কিসে সে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মহীয়ান!'
'তাই হবে!'—বলি খোদা আদমের পানে
চাহিলেন আস্থা ভরে। 'এ সংগ্রাম দানে
রাজি আছ, হে আদম?'
'—আছি প্রভু!' বলি

বলদৃপ্ত শির তুলি ভুবন উজলি
দাঁড়াইল সে তখন। দুইটি নয়ন
জ্বলিয়া উঠিল দুটি উল্কার মতন
তেজোদীপ্ত মহিমায়। কহিল সে ধীরে—
'তুমি যদি আশীর্বাদ রাখো মোর শিরে,
কী ভয় শয়তানে মোর? অনন্ত সংগ্রাম
চালাইব তার সাথে নিত্য অবিশ্রাম
লোক হতে লোকান্তরে; প্রাণ দিব, তবু
তার কাছে নতশির হইব না কভু।'

আদমের পানে চাহি কহিলেন খোদা—
'যাও তবে, হুঁশিয়ার হয়ে থেকো সদা।
আজি হতে শুরু হল অভিযান তব
গ্রহে গ্রহে লোকে লোকে নিত্য নব নব।
তুমি যে সৃষ্টির সেরা—শ্রেষ্ঠ গরীয়ান,
এ সত্যের যেন নাহি করো অপমান।'

প্রতীক্ষায়

নিস্তব্ধ নির্জন রাতি। মহাশূন্যমাঝে
কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য গ্রহতারাদল
জেগে আছে অতন্দ্র নয়নে। মনে হয়
স্বচ্ছ নীলিমার এক সমুদ্র-প্লাবন
ডুবাইয়া অন্তরীক্ষ—বিশ্বচরাচর
অনন্তকালের বুকে পাতিয়াছে তার
চিরন্তন অধিকার। সে নীল-সমুদ্রে
কবে কোন্ অতীতের অন্ধকার রাতে
প্রকাণ্ড জাহাজডুবি হয়েছিল যেন,
ছিন্নভিন্ন দিশেহারা যাত্রীরা তাহার
রক্ষাচক্র আঁকড়িয়া শির উঁচু করি
তাই যেন চলিয়াছে ভাসিয়া ভাসিয়া
অজানা দিগন্তপানে আশ্রয় সন্ধানে
কত যুগ হতে তাহা কেহ নাহি জানে।

অতি দূরে—অসীমের ওপার হইতে
ঝরিয়া পড়িছে শুভ্র জ্যোতির নির্ঝর

ভাসমান গ্রহপুঞ্জ পরে। মনে হয় :
সীমান্তের অন্তরালে আলোস্তম্ভ হতে
কোন্ এক নিদ্রাহারা রাতের প্রহরী
অবিশ্রান্ত ফেলিতেছে আলোক-প্রপাত
মুহ্যমান যাত্রীদের শিরে; যাতে তারা
আলোর ইঙ্গিত পেয়ে ভেসে ভেসে ধীরে
পৌঁছে যায় নিরাপদ বন্দরের তীরে।
নিম্নে দূরে দেখা যায় মাটির পৃথিবী
সদ্য-জাগা একখানি দ্বীপের মতন।
বাস্তুহারা কোন্ যেন মুহাজিরিনের
পুনর্বাসনের তরে এ বিশাল ভূমি
চিহ্নিত হইয়া আছে। এখনো সেখানে
হয় নাই কুটির নির্মাণ; বসে নাই
লোকালয়; শুধু তার পরিকল্পনার
রেখাচিত্র আঁকা আছে বিশ্বনিয়ন্তার
গোপন মানস-পটে। তবু যেন সেই
গুপ্ত কল্পনার কথা আভাসে ইঙ্গিতে
প্রকাশ পেয়েছে কিছু বাহির-ভুবনে।
দুঃসাহসী কত শিল্পী কত রূপকার
আত্মপ্রতিষ্ঠার লাগি আগেই আসিয়া
তাই যেন এইখানে জমাইছে ভিড়।
রূপশিল্পী সূর্য আসে ভোরের আকাশে
পৃথিবীরে জানায় তস্‌লিম্; রঙে রঙে
করে তারে বিচিত্রিত। ফুলে ফুলে তার
ভরে দেয় শ্যামাঞ্চল; আলোকে-পুলকে
ছন্দে-ছন্দে গানে-গানে কাননে-কাননে
বসায় সে রূপমেলা। রাতের আকাশে
সূর্যের সুন্দরী বধূ চতুর্দশী চাঁদ
হাসিমুখে দাঁড়ায় আসিয়া আকাশের
আঙিনায়; নানা ছলে নানা ভঙ্গিমায়
সে যেন করিতে চায় পৃথিবীর সাথে
মিতালি! তাকাইয়া দেখে তাই দুজনে
দুজনারে! দুই বোন দুই ছাদ থেকে
কর্মক্লান্ত দিবসের অবসান শেষে
কথা কয় যেন নিরালায়! লক্ষ লক্ষ
তারা—তারাও কৌতুকভরে চেয়ে রয়

পৃথিবীর পানে; মিটি-মিটি আঁখিঠারে
কী-যেন বলিতে চায় তারে। কোথা হতে
ভেসে আসে মেঘ; পৃথিবীরে ছায়া দেয়,
আলো দেয়, বৃষ্টি দেয়; সকাল-সন্ধ্যায়
খেলে কত লুকোচুরি খেলা। সমীরণ
কোথা হতে আসে ধীরে : দোদুল দোলায়
তরুশাখা দুলাইয়া যায়; কত পাখি
বাসা বাঁধে, গান গায় শাখায় শাখায়।
পৃথিবীরে কেন্দ্র করি দিকে দিকে তাই
উল্লাসের অন্ত নাই। তারে নিয়ে যেন
গোপন কথার নিত্য চলে কানাকানি
আকাশে বাতাসে গ্রহে তারায়-তারায়।
সারা সৃষ্টি কৌতূহলে বসে আছে যেন
কার আশাপথপ্রতীক্ষায়।

রাখাল খলিফা

সেনাপতি বীর আবুওবায়দা জেরুজালেমের তীরে
করেছে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ,
অর্ধচন্দ্র-পতাকা উড়িছে গগন-কিনারে ধীরে,
শঙ্কিত-ভীত-কম্পিত সারা দেশ।

জেরুজালেম—সে তীর্থক্ষেত্র নহে শুধু নাসারার,
মুসলিমও তারে সমান শ্রদ্ধা করে,
অতীত দিনের কত-না পুণ্য স্মৃতি সুরভি-ভার
বিজড়িত তার অন্তরে অন্তরে।

এমন পুণ্য তীর্থে কিরূপে যুদ্ধ হইবে তবে?
যুদ্ধ করিতে চাহে না কারোই প্রাণ,
বিনা যুদ্ধেই এই নগরীরে জয় করে নিতে হবে—
আবুওবায়দা মনে মনে তাই চান।

লিখিলেন তিনি নগরপতিরে স্থির করি তাই মন—
'নাহিকো মোদের যুদ্ধ করার সাধ,
স্বেচ্ছায় যদি করেন আপনি নগর-সমর্পণ,
ঘটিবে না তবে আর কোনো পরমাদ।

'নতুবা মোদের বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হবে,
উপায় তখন রহিবে না কিছু আর,
জেরুজালেমের পবিত্র বুকে রক্তের ঢেউ ববে'
নাহি লন যেন অপরাধ কিছু তার।'

শাসনকর্তা অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন শেষে—
যুদ্ধ করিলে হবে নাকো কোনো ফল,
বিশ্ববিজয়ী আরব-বাহিনী—নন্দিত দেশে দেশে,
রোধিবে তাদেরে—কে আছে ধরণী-তল?

লিখিলেন তিনি উত্তরে তাই—'শান্তিই যদি চান,
খলিফা ওমর দিন তবে দরশন,
তিনি এসে যদি খৃস্টানদেরে করেন অভয় দান,
এ মহানগরী করিব সমর্পণ।'

খবর পাঠাল আবুওবায়দা সত্বর মদিনায়,
শুনিয়া খলিফা আমিরুল-মুমেনিন
রাজি হইলেন নগরপতির রাখিতে অভিপ্রায়
যাবার লাগিয়া স্থির করিলেন দিন।

জেরুজালেমের পথ সে ভীষণ, নাহি কোনো পারাপার,
মাঝখানে তার মরুময় প্রান্তর,
নিদাঘ-সূর্য আগুন জ্বালায় বুকের উপরে তার
মরুসাইমুম্ বহে সে ভয়ঙ্কর।

সে পথ বহিয়া চলেন ওমর চড়িয়া উটের পরে
সাথে নিয়ে শুধু নওকর একজন,
বিশ্ব লুটায় চরণে যাঁহার, তাঁরি যাত্রার তরে
এই সম্বল—এই দীন আয়োজন।

সুমুখে বিপুল মরু-দিগন্ত, ধু-ধু করে চারিধার,
—উট টেনে চলে তারি মাঝে নওকর,
পথ হয়ে আসে ক্রমে বন্ধুর, চলা হয়ে ওঠে ভার
তপ্ত বালুকা তাহে কাঁটা-কঙ্কর।

ভাবেন খলিফা—'আমি উটে চড়ে চলেছি পরম সুখে,
কোন্ দোষে দোষী নওকর আজি মোর?

একই আল্লার বান্দা দুজনে, হাসি কাঁদি সুখে দুখে,
ব্যথা-বোধ আছে আমারি মতন ওর।

'কেন তবে এই মিথ্যা ছলনা বাহিরে মোদের মাঝে?
ইসলামে কোনো ভেদাভেদ কিছু নাই,
সম অধিকার দিয়াছে সে সবে ধ্যানে-ধারণায়-কাজে,
মুসলমান—সে মুসলমানের ভাই।'

এতেক ভাবিয়া নামেন খলিফা সহসা সে মরুপথে,
কহেন—'বন্ধু কষ্ট পেতেছ বড়?
ভাগাভাগি করে উটে চড়ি এসো দুজনে এখন হতে—
আমি টানি দড়ি, তুমি এইবার চড়ো।'

কুণ্ঠিত-ভীত রাখাল শুনিয়া খলিফার সেই বাণী
বলিল—'তওবা! তাও কি কখনো হয়?
আমি রব চড়ে, খলিফা যাবেন উটের লাগাম টানি?
জীবন থাকিতে এ কাজ কখনো নয়!'

না-ছোড় খলিফা, কোনো কথা তিনি তুলেন না তাঁর কানে,
রাজি হল তাই অগত্যা নওকর;
রাখাল চলিছে উটের পৃষ্ঠে—খলিফা লাগাম টানে!
এ মহাদৃশ্য অপূর্ব—সুন্দর!

এমনি করিয়া ভাগাভাগি করে সারাপথ দুজনায়
চলেন কষ্টে কোনোমতে ধীরে ধীরে,
দিন-রজনীর চেষ্টার শেষে একদিন অবেলায়
পৌঁছেন এসে জেরুজালেমের তীরে।

প্রবল-প্রতাপ খলিফা আসিছে রোম-শাসকের কাছে,
তাঁহার যোগ্য রাজ-সমাদর তরে
আবুওবায়দা পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়ে আছে,
নগরাধিপতি শত আয়োজন করে।

অবশেষে যবে খলিফার উট দেখা দিল প্রান্তরে,
রোমান শাসক সভাসদ নিয়ে তার
দাঁড়ালেন আসি সম্মুখে তাঁর অভিনন্দন তরে,
নব কুতূহল মনে জাগে বারবার।

এল যবে উট নগর-প্রান্তে দৃষ্টির সীমানায়,
খলিফা তখন টানিতেছিলেন দড়ি,
ভাগ্যচক্রে ছিল যার যাহা, খণ্ডাবে কে বলো তায়!—
রাখাল ছিল সে উটের পৃষ্ঠে চড়ি!

শাসনকর্তা দেখে নাই আগে খলিফারে কভু আর,
ভাবিল খলিফা আছেন উটের 'পরে,
কুর্নিশ করি রাখালেরে তাই দুই হাতে বারবার
নামাইয়া নিল পরম শ্রদ্ধাভরে!

হেনকালে আসি আবুওবায়দা হলেন সম্মুখীন,
বলিলেন, 'না, না, খলিফা তো উনি নন,
উনি নওকর;—ইঁনিই হলেন আমিরুল মুমেনিন,
খলিফা ওমর—এঁরি সাথে কথা কন।'

বিস্মিত আজি নগরাধিপতি, পুলকিত তার প্রাণ,
স্বর্গের ছবি নামিল কি দুনিয়ায়?
মানবতা যেন রূপে ধরে তার নয়নে মূর্তিমান—
হৃদয় তাহার লুটাতে চায় ও-পায়!

অমনি তখনি করিলেন তিনি নগর সমর্পণ,
কোনো দ্বিধা তার জাগিল না হিয়া-মাঝে,
কহিলেন তিনি খলিফারে করি মধুর সম্ভাষণ—
'বিশ্বের রাজা তোমারেই হওয়া সাজে!'

জীবন-বিনিময়

বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ্ নাহি চোখে তার—
পুত্র তাহার হুমায়ূন বুঝি বাঁচে না এবার আর!
চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ অন্ধকার।

রাজ্যের যতো বিজ্ঞ হেকিম-কবিরাজ-দরবেশ
এসেছে সবাই, দিতেছে বসিয়া ব্যবস্থা সবিশেষ,
সেবা-যত্নের বিধি-বিধানের ত্রুটি নাহি এক লেশ!

তবু তার সেই দুরন্ত রোগ হটিতেছে নাকো হায়,
যত দিন যায় দুর্ভোগ তার ততই বাড়িয়া যায়—
জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্ত রবির প্রায়।

শুধাল বাবর ব্যগ্রকণ্ঠে ভিষকবৃন্দে ডাকি—
'বলো বলো আজি সত্য করিয়া, দিও নাকো মোরে ফাঁকি,
এই রোগ হতে বাদশাজাদার মুক্তি মিলিবে না কি?'

নত মস্তকে রহিল সবাই, কহিল না কোনো কথা,
মুখর হইয়া উঠিল তাদের সে নিঠুর নীরবতা
শেল সম আসি বাবরের বুকে বিঁধিল কিসের ব্যথা!

হেন কালে এক দরবেশ উঠি কহিলেন—'সুলতান,
সবচেয়ে তব শ্রেষ্ঠ যে ধন দিতে যদি পারো দান,
খুশি হয়ে তবে বাঁচাবে আল্লা বাদশাজাদার প্রাণ!'

শুনিয়া সে-কথা কহিল বাবর শঙ্কা নাহিকো মানি—
'তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কোরবানী,
সবচেয়ে মোর শ্রেষ্ঠ যে-ধন জানি তাহা আমি জানি।'

এতেক বলিয়া আসন পাতিয়া নিরিবিলি গৃহতল
গভীর ধেয়ানে বসিল বাবর—শান্ত অচঞ্চল,
প্রার্থনা-রত হাত দুটি তার, নয়নে অশ্রুজল।

কহিল কাঁদিয়া—'হে দয়াল খোদা, হে রহিম-রহমান,
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ,
তাই নিয়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ করো মোরে প্রতিদান।'

স্তব্ধ-নীরব সারা গৃহতল, মুখে নাহি কারো বাণী,
গভীর রজনী, সুপ্তি-মগন নিখিল বিশ্ব-রানী;
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিতেছে যেন গোপন কী কানাকানি!

সহসা বাবর ফুকারি উঠিল—'নাহি ভয়, নাহি ভয়,
প্রার্থনা মোর কবুল করেছে আল্লা সে দয়াময়,
পুত্র আমার বাঁচিয়া উঠিবে—মরিবে না নিশ্চয়।'

ঘুরিতে লাগিল প[illegible] বাবর পুত্রের চারিপাশ—
নিরাশ হৃদয়ে [illegible] আশার দৃপ্ত জয়োল্লাস,
তিমির রাতের [illegible]রণে তোরণে ঊষার পূর্বাভাস!

সেই দিন হ[illegible] রোগ-লক্ষণ দেখা দিল বাবরের,
হৃষ্ট-চিত্তে গ্র[illegible]ণ করিল শয্যা সে মরণের—
নূতন জীবনে হুমায়ূন ধীরে বাঁচিয়া উঠিল ফের।

মরিল বাবর—না, না, ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়?
মরিয়া বাবর অমর হয়েছে, নাহি তার কোনো ক্ষয়—
পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়!

রাখী ভাই

বাহাদুর শাহ্ আসছে ধেয়ে করতে চিতোর জয়
সঙ্গে নিয়ে বিপুল সেনাদল,
চিতোর-রানী কর্ণবতীর তাই জেগেছে ভয়—
রাজপুতানা আতঙ্কে টলমল।

দেশ জুড়ে আজ চলেছে তাই পূজার আয়োজন,
উঠ্ছে তুমুল ঘণ্টা-কাঁসর-নাদ,
অসি এবং অশ্ব-পূজায় কেউ বা নিমগন
কেউ মাগিছে দেবীর আশীর্বাদ।

কর্ণবতী বসে বসে ভাবছে মনে তার :
নারী আমি—নিতান্ত দুর্বল,
শক্তি-সহায় না যদি পাই, উপায় নাহি আর,
সবই হবে ব্যর্থ ও নিষ্ফল।

কে আছে বীর এই ভারতে এমন মহৎপ্রাণ
চিতোরের এই দুর্দিন-সন্ধ্যায়
পার্শ্বে এসে দাঁড়ায় তাহার, রাখতে তাহার মান!
ব্যাকুল রানী সেই সে ভাবনায়।

হঠাৎ তাহার পড়ল মনে—বাদশা হুমায়ূন
উদার-হৃদয় অদ্বিতীয় বীর,

বাহাদুরের চেয়ে তাহার শক্তি শতগুণ,
রাখতে জানে মান সে রমণীর।

অনেক ভেবে অবশেষে হুমায়ূনের ঠাই
লিখল রানী লিপি সে একখান
'আজ হতে বীর হলে তুমি আমার 'রাখী ভাই'
শীঘ্র এসে বাঁচাও বোনের প্রাণ!'

দূতের হাতে দিল লিপি, আর সে রাখী তার—
যাত্রাপথে বাহির হল দূত,
উৎসাহ ও কৌতূহলের অন্ত নাহি আর—
অবাক সবাই, ব্যাপার যে অদ্ভুত!

বাদশা তখন বাংলাদেশে ছিলেন অনেক দূর
শেরের সাথে চলছে লড়াই তার,
পাঠান বীরের দর্প এবার না যদি হয় চূর
রাজ্য রাখাই হবে তাহার ভার!

এমনি কঠিন দুঃসময়ে কর্ণবতীর দূত
হাজির হল হুমায়ূনের পাশ,
লিপি দিল, আর দিল সেই রাঙা রাখীর সূত,
মুখে তাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস!

লিপি পেয়ে আত্মহারা হুমায়ূনের প্রাণ,
কী করিবে, ভেবেই নাহি পায়,
শত্রুরে আজ ছেড়ে গেলে চরম অকল্যাণ—
কিরূপে বা রাখীই ফিরান যায়!

একটি নারী করুণ স্বরে মাগছে শরণ তার
'ভাই' বলে সে করেছে আহ্বান,
সে আহ্বানে খুলবে না কি তাহার হৃদয়-দ্বার—
সাড়া কি আজ দিবে না তার প্রাণ!

থাকুক শত বিঘ্ন-বাধা—বাদশাহী তার যাক,
তবু তাহার 'বোন'কে বাঁচান চাই;
হোক বাহাদুর স্বজাতি তার—হিন্দু 'বোনে'র ডাক
শুনবে আজি মুসলিম তার 'ভাই'।

ক্ষান্ত করি এক নিমেষেই যুদ্ধ-অভিযান
চিতোর পানে ছুটল হুমায়ূন,
কোন্ অসীমের ডাক শুনে আজ চঞ্চল তার প্রাণ,
একটি রাঙা রাখীর এত গুণ!

লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে লড়ল এসে বীর—
কামান-গোলা ছুটল সে প্রচুর,
পড়ল লুটে হাজার হাজার মুসলমানের শির,
বাহাদুরের দর্প হল চূর!

চিতোর-ভূমি মুক্ত হল অমনি হুমায়ূন
চলল ছুটে বোনের খোঁজে তার,
রাজপুরীতে উঠল বেজে সুর সে অকরুণ—
কর্ণবতী নাইকো বেঁচে আর!

ব্যাকুল আশায় চেয়ে চেয়ে হুমায়ূনের পথ
কর্ণবতী গণছিল দিনরাত,
অবশেষে হল যখন বিফল মনোরথ—
জহর-ব্রতে করল জীবনপাত!

গভীর ব্যথায় হুমায়ূনের স্বর সরে না আর—
বোনের তরে ভাই কেঁদে আজ খুন,
এই জীবনে হল নাকো দেখা দেখো দুজনার—
সেই বেদনায় ক্ষুব্ধ হুমায়ূন!

হেথায় ওদিক সুযোগ পেয়ে কিছুদিনের পর
যুদ্ধ দিল শের শা' পুনরায়,
হুমায়ূনের রাজ্য গেল—হল দেশান্তর—
একটি রাঙা রাখীর তরে হায়!

মুসাদ্দাস-ই-হালী

২৯৩
ধনীদিগের সব কাহিনী শুনেছ তো ভাই,
আলেমদিগের কোনো কথাও বলতে বাকি নাই।
শরিফ্‌দিগের চালচলনও দেখছ চমৎকার,
বসে আছে তারা এখন ধ্বংসপথের দ্বার!

এই পুরাতন গৃহ এখন ভেঙে পড়ার ভয়,
ছাদের সাথে থামগুলির আর নাইকো সমন্বয়!

২৯৪
যা ঘটেছে পাচ্ছি তাতে একটা নিদর্শন,
সময়ের এই গরদিশ ভাই খণ্ডাবে কোন্ জন?
সময় যারে উচ্চ হতে নিম্নে ফেলে, তার
মাটির 'পরে দাঁড়িয়ে আবার উচ্চে উঠা ভার।
আমাদেরো তেমনি দশা দেখছি এখন ভাই
মরণ ছাড়া অন্য কিছুই শ্রেয় যেন নাই।

২৯৫
যতই করুক উন্নতি আর যতই করুক নাম
সকল দেশের সকল জাতির ইহাই পরিণাম।
সবার সাথেই কালের এমন কুটিল ব্যবহার,
ভোজবাজি তার চিরদিনই এমনি চমৎকার।
অনেক নদীই বয়ে এসে শুকিয়ে গেছে শেষ,
ফুলের ফসল ফল্‌ত যেথায়, এখন বিরান দেশ।

২৯৬
'পিরামিডে'র নির্মাতাগণ কোথায় এখন হায়?
রোস্তম-বীর-বংশ এখন খুঁজে পাওয়াই দায়।
মিশর দেশের বাদশাদেরও হয়েছে এই হাল—
গ্রাস করেছে তাদের সবায় দুরন্ত ওই কাল!
এই দুনিয়ার যা-কিছু সব লোপ হয়ে যায় ভাই
'কাল্‌দীয়' আর 'সাসানিদের' বংশ এখন নাই!

২৯৭
একমাত্র খুদাতা'লাই সত্য এবং সার,
নিখিল ধরায় থাক্‌বে তাঁহার পূর্ণ অধিকার।
তিনি ছাড়া আর-যা-কিছু সবই হবে লয়
কেউ রহেনি, কেউ রবে না—এ-কথা নিশ্চয়।
বাদশা-গোলাম এই দুনিয়ায় সবাই মুসাফির
বিদায় নিয়ে যেতে হবে—এইটে জেনো স্থির।

[আলতাফ হোসেন হালী]

উট-চালকের গান

ওরে পথিক উট আমার—
তাতার-হরিণ ক্ষিপ্রতার,
তুই দিরহাম তুই দিনার—
কম-বেশি হয় হোক না তার
জীবন্ত দান তুই খুদার—
জোর কদমে চল্ রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের ॥

দিলরুবা তুই রূপ মধুর
তোর তরে মোর প্রাণ বিধুর
পাগল-করা তুই যে হুর
লায়লা—সে তোর ঈর্ষাতুর
মাঠের মেয়ে পায় নূপুর!
জোর কদমে চল্ রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের ॥

প্রখর যখন রবির কর
মরুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ু
চন্দ্রা রাতে—হে সুন্দর,
উল্কা-বেগে নিরন্তর
সম্মুখে হও অগ্রসর।
জোর কদমে চল্ রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের ॥

উড়ন্ত মেঘ আসমানের
পাল-হারা নাও সমুদ্রের
খিজির তুমি যুলমাতের
ভয় কোরো না সংকটের—
জোর-কদমে চল্‌রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের॥

এয়মনে রও সাঁঝ-বেলায়
করন্ দেশে রাত পোহায়
পথের ধূলি মূর্ছা যায়
যুঁই হয়ে সব পায় লুটায়
চল্ রে চীনের হরিণ প্রায়—

জোর কদমে চল্ রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের ॥

চাঁদের সফর খতম প্রায়
টিলার ধারে মুখ লুকায়
প্রভাত হেসে ওই তাকায়
রাতের পির্‌হান নাইকো গায়
করছে সেবন মাঠের বায়!
জোর কদমে চল্ রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের ॥
আমার বীণার এই যে তান
পাগল করে সবার প্রাণ
ঘণ্টাধ্বনি এই সে গান
হয় এতে মুশ্‌কিল্ আসান্
কা'বার পথে তোল্ নিশান—
জোর কদমে চল্ রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের ॥

[ইকবাল]

মুনাজাত

জাগ্রত আশা অন্তরে দাও, হে খুদা, মুসলিমের।
আত্মা তাদের ব্যথিয়ে উঠুক, চঞ্চল হোক ফের ॥
ফারান-গিরির প্রতি ধূলিকণা হোক্ পুন রওশন।
জাগাইয়া দাও আবার তাদের আগ্রহ জীবনের ॥
অন্ধের চোখে ফের তুমি দাও নূতন দৃষ্টি দান।
আমি যা দেখেছি, তুলে ধরো তাহা আঁখিকোণে তাহাদের ॥
স্তব্ধ হৃদয়ে জাগাও তাদের হাশরের কোলাহল।
শূন্য পাল্‌কি ভরে দাও প্রেমে আশেক্ ও মাশুকের ॥
পথহারা এই হরিণেরে তুমি দেখাও কাবা'র পথ।
শহরবাসীর অন্তরে দাও প্রেম সে ময়দানের ॥

পথিকদিগের চরণে আবার চলার ছন্দ দাও।
গতির আগুনে পুড়ে যাক যত বিঘ্ন কণ্টকের ॥
সুরাইয়া সম গগনচুম্বী লক্ষ্য তাদের হোক।

কূল-ঘেরা নদী আযাদী লভুক মুক্ত-সমুদ্রের ॥
আঁধার যুগের বুকে এঁকে দাও প্রেম-কলঙ্ক-দাগ।
লজ্জায় যেন মুখ ঢেকে রয় চাঁদ সে আস্‌মানের ॥

আমি বুলবুল্‌, কাঁদি বসে এই ফুলঝরা বাগিচায়।
হে দাতা, তাছির হয় যেন কিছু আমার ক্রন্দনের ॥

[ইকবাল]

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841801922206